৪৩বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
গীতা কেন?	সুকুমারী ভট্টাচার্য	২
উৎস মানুষের পুরনো সংখ্যা থেকে		৩
দশাবতার ব্যাখ্যা	অনু: আশীষ লাহিড়ী	৪
তন্তর মন্তর	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	৭
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সমীরকুমার ঘোষ	১১
বিজ্ঞান আর মুখোশ	অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়	১২
করে দেখো ভালো লাগবে (৩)	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	১৪
হেঁচকি	গৌতম মিস্ত্রী	১৬
জঞ্জাল সমাচার	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯
মূল্যবোধের সংকট ও বিকল্প	সমর বাগচী	২০
আমার দাদা সমর বাগচী	সঞ্জয় অধিকারী	২২
স্থবির দাশগুপ্ত	আশীষ লাহিড়ী	২৪
হুগলি নদীর নোনা জল	তপোব্রত সান্যাল	২৬
পরিবেশ নিয়ে ছড়া	প্রশান্ত দাস	২৭
বায়ুমণ্ডল পরিচয়	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	২৮
শৈশবের ভয়ের চারা	অরুণালোক ভট্টাচার্য্য	৩১
হোমিওপ্যাথি নিয়ে গবেষণা	সুব্রত রায়	৩৪
বেটি বাঁচাও	পূরবী ঘোষ	৩৭
পুস্তক পর্যালোচনা		৩৮
ইচ্ছাপত্র		৩৯
চিঠিপত্র		৪০

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩,

পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

কিছু মানুষের প্রয়াণে তাঁদের পরিবারের বাইরে সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা আমরা জানি। কয়েক মাসের ভেতর প্রয়াত হলেন বিজ্ঞান প্রচারক শিক্ষক আমাদের অভিভাবকসম সমর বাগচী, নদী বিশেষজ্ঞ তপোব্রত সান্যাল, পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়াতদের স্মরণ করি। এই সংখ্যায় প্রয়াত সমর বাগচী ও তপোব্রত সান্যালের দুটি লেখা পুনর্মুদ্রিত হল।

চন্দ্রযান-৩ চাঁদে নামার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বাজির আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। ওদিকে ইসরোর বিজ্ঞানীদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন চন্দ্রযান যাতে সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করে সেই কামনায় দেবতার কাছে ছুটে গেলেন। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের নিরলস চেষ্টার ফলে যে সাফল্য এল তথাকথিত ঈশ্বর তাতে ভাগ বসালেন। ঈশ্বর বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক আর পথে-ঘাটে পেন্নাম ঠোকা আমজনতার ভেতর ফারাকটা যে ক্রমশ কমে আসছে তা সহজেই অনুমেয়। দেবতার কাছে নতজানু হয়ে থাকা মানুষের হাতে কূট তর্কের অস্ত্র তুলে দিলেন সেইসব বিজ্ঞানীরা যাঁদের সোচ্চারে বলার কথা ছিল 'ওসব ভগবান-টগবান সব মিথ্যে, মানুষকে স্রেফ ভাঁওতা দেওয়ার হাতিয়ার বই কিছু না'। খবরে প্রকাশ ভারতীয় ফুটবল দল নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ভাস্কর শর্মা নামে এক জ্যোতিষীকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেছে।

আমরা আশা করছি আসন্ন কলকাতা বইমেলায় দুটি বই প্রকাশ করতে পারব। 'স্বাস্থ্যের সাতকাহন' বইটি এতদিন অখণ্ড ছিল। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। আপাতত প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবে, পরে দ্বিতীয়টি। এছাড়া 'জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে' বইটি সমাজকর্মী বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা। বইটি খানিকটা ভ্রমণ কাহিনীর ঢঙে লেখা হচ্ছে বলে লেখিকা জানিয়েছেন। যেখানে মানুষের কথাই মুখ্য। প্রতিরোধ কেমন করে হয় — সেই কাহিনী।

আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ইন্দুমতী সভাগৃহে ত্রয়োদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। 'বিজ্ঞানীর নৈতিকতা বনাম ভারতীয় জ্ঞানধারা' বিষয়ে বলবেন অধ্যাপিকা রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়।

উ মা

আহরণ

গীতা কেন?

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সুকুমারী ভট্টাচার্যের অসামান্য অনুসন্ধানমূলক ছোট একটি গ্রন্থ *গীতা কেন?* কুষাণ যুগে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রচিত ধর্মগ্রন্থটির সার্থক বিশ্লেষণ, যা সেই সময়ের সমাজ দর্শনকে সহজে বুঝতে সাহায্য করে। দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী বলেছেন— 'গীতা যতটা সম্মানিত হয়, ততটা পঠিত বা বুদ্ধিদ্বারা আত্মসাৎ করা হয় না এবং যতবার আবৃত্তি করা হয় ততটা বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে না।' সেইসময়ে বহুধা বিভক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক দ্বন্দ্বের নিরসনে শ্রীকৃষ্ণের গীতামাহাত্ম্যের প্রবর্তন সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল বলেই লেখক মনে করেন। কৃষ্ণ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। উপসংহারে লেখকের মন্তব্য : গীতা একটি অসামান্য ধর্মগ্রন্থ যার কেন্দ্রে এক অসামান্য বুদ্ধিমান পুরুষ কৃষ্ণ। সম্প্রতি গীতা প্রেসকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তা কতটা যুক্তিসম্মত সুকুমারী ভট্টাচার্যের "*গীতা কেন?*" তারই উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে। তারই একটু নমুনা আহরণে তুলে ধরা হল। — স.ম.

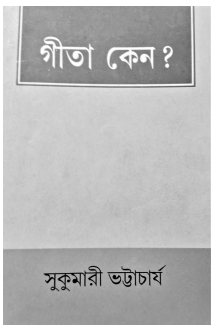

গীতার খ্যাতির একটি বিশেষ সূত্র হল একটি সর্বজনপ্রিয় শ্লোক: "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।" কর্মেই শুধু তোমার অধিকার, ফলে কখনোই নয়। কর্মফলের হেতু কখনও হয়ো না, (তা বলে) অকর্মেও আসক্ত হয়ো না। এর প্রথমাংশটা সকলের মুখে মুখে ফেরে এবং প্রায় সকলেই মনে করেন এর অর্থ হল মানুষকে নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত করা ও উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় এর মধ্যে অন্য কথাও আছে। সাধারণ মানুষ কাজ করুক ফলের আশা না করে শুধু কাজের জন্যই কাজ করুক। দার্শনিক কান্ট্ যেমন বলেছেন, "কর্মের মূল্য আসে তার প্রণোদনা থেকে, তার ফল থেকে নয়।" এভাবে দেখলে নিষ্কাম কর্ম করার প্রণোদনটা বোঝা না গেলেও সেইটেই যে কৃষ্ণের অনুমোদিত তা বোঝা যায়। এমন নয় যে কৃষ্ণ কর্মে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং ফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। কর্ম থাকলে তার ফলও থাকবেই। কিন্তু কৃষ্ণ খুব সচেতন ভাবেই বলেন সেই ফল কখনোই সেই ব্যক্তি পাবে না যে কর্মটি করেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কর্ম শ্রমিকের কর্তব্য, ফল ধনিকের লভ্য। কর্মফলের হেতুও সে হবে না এবং অকর্মেও তার যেন প্রবৃত্তি না হয়।

আগেই যেমন কিছুটা আলোচনা করেছি, এর পরও ত একটা কথা থেকে যায় : কর্মফলটার কী হবে? যে কাজ করবে সে ফল ভোগ করবে না কখনো। কিন্তু কর্মফলটা তো থেকে যাবে। স্পষ্ট বোঝা যায় এই ফলটা সমাজের উচ্চ, ধনী, শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ ভোগ করবে। আজও সমাজে এই বিভাজন প্রচলিত শ্রমিক, কৃষক, মজদুর, কাজই নিরন্তর করবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেটভাতায়); তার কর্মের থেকে যে ফল উদ্‌গত হবে, তাতে, তার কোনো অধিকার নেই। (পৃ ৫৬-৫৭)

কর্ম বলতে গীতায় শুধু উৎপাদনমুখী কর্মই বোঝায় না, যজ্ঞকেও বোঝায়। এর পূর্বে যজ্ঞই ছিল ধর্মক্রিয়া। যজ্ঞও কর্ম, কিন্তু সেই কর্ম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং এই বোধ সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত ছিল যতদিন না মোক্ষের ধারণা প্রাধান্য লাভ করল। তখন আনুপাতিক মূল্যায়নে ধর্ম, অর্থের পরে কাম এবং সর্বোচ্চ স্থান পেল মোক্ষ। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হলেন তখনই — ব্রহ্মে লীন হওয়াই মোক্ষ বলে — মোক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য ও সাধনা বলে বিবেচিত হল। এবং এই বোধ চলে এসেছে দীর্ঘকাল ধরে। এখনও এটিই সর্বপ্রধান। গীতা এ সম্বন্ধে দু'রকম কথা বলে: এক, "সর্বগত ব্রহ্মনিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।" আর অন্যত্র বলে সমুদ্রে নদীর জলপ্রবাহের যা সার্থকতা, কৃষ্ণের আগমনের পরে সমাজে যজ্ঞের ততটুকুই সার্থকতা। অর্থাৎ যজ্ঞ তার পূর্ব প্রতিষ্ঠা হারিয়েছে। এটা সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ঘটেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গীতার শুরুতেই দেখি, যখন অর্জুন তাঁর বর্ণধর্ম পালন করতে অস্বীকার করছেন, কারণ, তার মধ্যে হিংসা আছে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে অহিংসা সমাজে একটি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে পরিণত হয়েছিল। এই প্রভাবেই যজ্ঞ তখনও সমাজে ইতস্তত চললেও মূল ধর্মবোধে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত। তাই যজ্ঞ কর্ম কিন্তু কৃষ্ণ সমর্থিত ধর্ম নয়।

যারা এ জীবনে শুধু কাজ করে যাবে, ফলভোগ করতে

পারবে না তাদের জন্য শাস্ত্র এবং গীতা একটা বড় রকমের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছে, তা হল জন্মান্তর, একথা আগেও বলেছি। রামায়ণ, মহাভারত সব গ্রন্থই এ ব্যবস্থা করেছে। গীতায় কৃষ্ণ প্রথম দিকেই অর্জুনকে বলেন, যে জন্মেছে সে অবশ্যই মরবে, আর যে মরেছে সে অবশ্যই জন্মাবে। অতএব যে এজন্মে সুখসমৃদ্ধি পেল না, পরজন্মে সে এসব পেতে পারে। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস বহু আগে থেকেই সমাজে রয়েছে; জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম দুটিই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণ্যধর্মও এ বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল। ফলে শূদ্র ও নারীকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত করেও তাদের আশ্বাস দেওয়া যেত : এজন্মে পেলে না বটে কিন্তু পরজন্মে ঠিক পাবে, যদি উপযুক্ত ধর্মনির্দিষ্ট কর্ম কর। যুক্তিতে এ আশ্বাসের কোনো ভিত্তি ছিল না, কিন্তু এ আশ্বাস এমন লোভনীয় যে মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করত। করত অনন্যোপায় হয়েও বটে, না করলে ত তার ইহজন্ম পরজন্ম দুই-ই ফাঁকা হয়ে যাবে। যার চেয়ে এজন্মে পেলাম না পরজন্মে পাব, এমন একটা আশ্বাস থাকলে, বর্তমানের দুঃখটা কতকটা সহনীয় হয়। জন্মান্তরবাদের পক্ষে প্রমাণ যুক্তি ওসব কিছুই ছিল না, কিন্তু এর কোনো বিকল্পও তো ছিল না কোথাও। তাই জন্মান্তরে বিশ্বাস দু-এক স্থানে অন্যভাবে বলা আছে — 'ক্ষয়' হচ্ছে সংসারে যা কিছু ক্ষয়শীল, অনিত্য তাই; এ হল আধিভৌতিক। যা কিছু নিত্য তা আধিদৈবিক, দেবতাদেরও ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ব্রহ্ম। আর যা কিছু যজ্ঞ ছাড়িয়ে অধিযজ্ঞ, তা হল অবতার। গীতায় কৃষ্ণ তাই অধিযজ্ঞ। গীতার একটি প্রধান প্রতিপাদ্য হল কৃষ্ণের অবতারত্ব। (পৃ. ৬২-৬৩)

উ মা

উৎস মানুষ পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকে — এপ্রিল-জুন, ১৯৮১ (৬)

কেমন ছিল সংখ্যাগুলি? তারই কিছু নমুনা তুলে ধরার প্রয়াস মূলত নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় বছরে (১৯৮১) প্রতিমাসে একটি করে বার্ষিক বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি সংখ্যা কুড়ি পাতা— পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। দ্বিতীয় তিন মাসের কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

দ্বিতীয় বর্ষ এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যার বিষয়সূচি ছিল ঃ আহরণে — '**বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব এবং যোশেফ নীডহাম**'; নতুন লেখা — '**দানিকেনের দেবতাতত্ত্ব—একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন**' (প্রথম অংশ); ধারাবাহিক উপন্যাস '**উৎসপুরুষ**'; সাপ নিয়ে কিংবদন্তি সিরিজে উল্লেখযোগ্য লেখা ইন্দ্রনাথ (অশোক) ব্যানার্জি'র '**সাপের সঙ্গে চেনা পরিচয়**' — এই লেখায় বিস্তারিত জানা যাবে তীব্র বিষ, ক্ষীণ বিষ ও নির্বিষ সাপ সম্পর্কে এবং সাপ চেনার উপায়; সংখ্যার আরও লেখা — '**ত্রিনয়নের গোপন কথা**', '**ঘুমের ওষুধ নেশার বড়ি এবং তাদের বিষক্রিয়া**' এবং শেষ পৃষ্ঠায় শোকসংবাদ '**চিরনিদ্রায় প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র**'।

দ্বিতীয় বর্ষ মে ১৯৮১ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে '**প্রয়াত বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র প্রসঙ্গে**' সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য স্মৃতিচারণা সহ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা '**মনে পড়ে**' তৎসহ তাঁর রচনাপঞ্জি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সেই সময় সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের বিতর্কিত লেখা '**মৃতদের সঙ্গে কথোপকথন ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি**'— পাশ্চাত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটলেও occultism বা গুপ্তবিদ্যা সমাজকে যেভাবে প্রভাবিত করত সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমীরণ মজুমদারের সেই সময়ের জনপ্রিয় রচনা '**দানিকেনের দেবতাতত্ত্ব—একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন**'—দ্বিতীয় কিস্তির এই সংখ্যায় শেষ হয়। ধারাবাহিক '**উৎসপুরুষ**' এবং সাপ নিয়ে কিংবদন্তির দ্বিতীয় অংশ '**সাপের সঙ্গে চেনা পরিচয়**' পাঠকদের দরবারে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়াও প্রশ্নোত্তর বিভাগে '**নিশির ডাক কেন**'-র রহস্য সম্পর্কে জানা যাবে।

দ্বিতীয় বর্ষ জুন ১৯৮১-র আহরণে '**বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব এবং ফ্রেডরিক জোলিও কুরী**' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা, '১৯৩৫-এ নোবেল বিজয় করেও যিনি নিজেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে বিকিয়ে দেন নি, তেমনি এক ব্যক্তিত্ব এই ফ্রেডরিক। এই লেখায় ফ্রেডরিক সম্পর্কে গ্রিক কবির একটি কবিতার শেষ অংশ — ''একটাই শুধু অপরাধ---তোমার মত/ভালোবেসেছি/শান্তি ও স্বাধীনতা।'' সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রথম অংশ '**আচার অনুষ্ঠানঃ ভিত্তি ও তাৎপর্য**' বাঙালির বিবাহ-আচার নিয়ে আলোকপাত করেছে, যেখানে শাঁখা-সিঁদুর-লোহা যার বৈদিক ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য লেখা '**আবিষ্কারের অন্তরালে পেনিসিলিন, ফ্লেমিং ও চেইন**' এবং '**চাক্ষুষ যন্ত্রণা**' উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত লেখায় conjunctivitis /জয়বাংলা কিভাবে ছড়ায় ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। ধারাবাহিক রচনা '**উৎসপুরুষ**' এবং '**সাপ নিয়ে কিংবদন্তি**' ছাড়াও মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের লেখা '**জ্যান্ত কবর**' যে মন্ত্রশক্তির কাজ নয় তা বিশদে জানা যাবে। সংখ্যাটি শেষ হয়েছে '**মরণ সাগর (ডেড সি)**' লেখা এবং প্রশ্নোত্তর বিভাগ দিয়ে।

উ মা

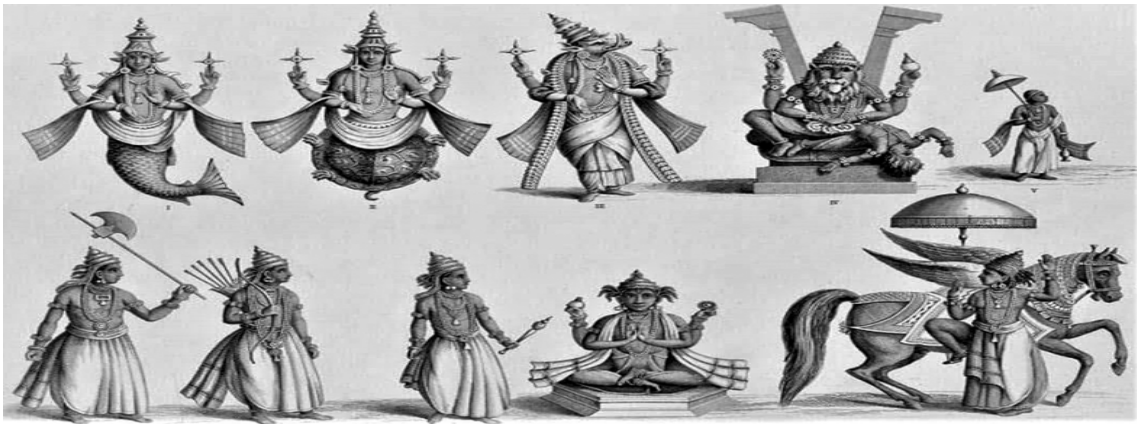

হিন্দু অবতারবাদ (শেষ পর্ব)

জোতীরাও ফুলে
অনুবাদ ঃ আশীষ লাহিড়ী

পরশুরাম, মাতৃহত্যা, একুশ দফা অভিযান, রাবণের কাছে খান্ডেরাওয়ের আশ্রয়ভিক্ষা, নয় বিভাগের ন্যায় সমাহর্তা, সাত জলকুমারী, বাড়ির ভিতে কালো সুতো-জড়ানো জ্যান্ত মাহার পুঁতে ফেলার রীতি, ব্রাহ্মণ বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ, ক্ষত্রিয় শিশুনিধন, পরাজয়ের পর পরশুরামের আত্মহত্যা, পরশুরামের অমরত্ব নিয়ে প্রশ্ন

ধোন্দিবা ঃ প্রজাপতির পর কে ব্রাহ্মণদের শাসন করত?

জোতীরাও ঃ পরশুরাম।

ধোন্দিবা ঃ কেমন স্বভাব ছিল তার?

জ্যোতীরাও ঃ পরশুরামটা ছিল একটা গুণ্ডা; উদ্ধত, ভয়ানক, বর্বর একটা পাজি লোক। নিজের মা রেণুকাকে গলা কেটে খুন করতে একটুও বাধেনি তার।[১] হাট্টাকাট্টা চেহারা ছিল তার, সে ছিল এক ওস্তাদ তিরন্দাজ।

ধোন্দিবা ঃ তার শাসনকালে কী ঘটেছিল?

জোতীরাও ঃ প্রজাপতির মৃত্যুর পর বাকি মহা-অরিরা, যাদের ব্রাহ্মণরা ধরতে পারেনি, তারা ব্রাহ্মণদের দাসত্ব থেকে ভ্রাতৃসম মহা-অরিদের মুক্ত করবার জন্য একুশবার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এতই দুর্ধর্ষ ছিল সে দ্বৈরথ যে তাঁদের নামই হয়ে গেল *দ্বৈতি*। তারই অপভ্রংশ হল দৈত্য। শেষ পর্যন্ত পরশুরাম এসে যখন তাঁদের পর্যুদস্ত করল, তখন সেই নিধনকাণ্ডে একেবারে ভগ্নমনোরথ হয়ে মহা-অরিদের মধ্যে কিছু ওস্তাদ যোদ্ধা পালিয়ে গিয়ে তাঁদের বন্ধুদের আড্ডায় গিয়ে বাকি দিনগুলো কাটালেন। যেমন জেজুরির খাণ্ডেরাও আশ্রয় ভিক্ষা করলেন রাবণের কাছে, নয় বিভাগের ন্যায় সমাহর্তা আর সপ্তরক্ষিতরা সবাই পালিয়ে চলে গেলেন তাল কোঙ্কনে[২], সেখানেই বাকি দিনগুলো গোপনে কাটালেন। তাই ব্রাহ্মণরা তাদের হেয় করবার জন্য মেয়েদের নাম দিল। নয় বিভাগের ন্যায় সমাহর্তার নাম দিল 'নয় খানার (ছোট্টো এক অংশ) জনাই'; আর সপ্তরক্ষিতদের নাম দিল 'সাত জলকুমারী'। অন্য যেসব মহা-অরিদের হারিয়ে দিয়ে পাকড়াও করল পরশুরাম, তাঁদের সকলকে বাধ্য করা হল এই দিব্যি গালতে যে তাঁরা আর কক্ষনো ব্রাহ্মণদের সঙ্গে লড়াই করবেন না। এই অবমাননার চিহ্ন হিসেবে তাঁদের গলায় একটা কালো সুতো বাঁধতে বাধ্য করা হল। এরপর পরশুরাম হুকুম জারি করল, মহা-অরিদের ভ্রাতৃসম অন্যান্য শূদ্ররাও যেন তাঁদের অচ্ছুৎ করে রাখেন। তারপর সে এইসব ওস্তাদ মহা-অরিদের হরেক রকম অপমানসূচক নামে ডাকবার রেওয়াজ চালু করল, যথা অতিশূদ্র, মাহার, অন্ত্যজ, মাং, চণ্ডাল প্রভৃতি। তাঁদের

ওপর এমন ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করল যে সারা দুনিয়ার ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। একটা উদাহরণ। বেচারী ক্ষত্রিয়দের ওপর শোধ তোলার জন্য নিষ্ঠুর বদমাশটা ব্রাহ্মণদের বাড়ির ভিত্তিমূলে সস্ত্রীক মাংদের জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার রেওয়াজ চালু করল। যন্ত্রণার আর্তনাদ চাপা দেওয়ার জন্য তাদের গলায় সিঁদুর আর তেল ঢেলে দেওয়া হত। মুসলিমরা ভারতে আসার পর এই বীভৎস প্রথা আস্তে আস্তে উঠে যায়। মহা-অরিদের সঙ্গে লড়াইয়ে পরশুরামের দলেরও বেশ কিছু লোকের প্রাণ গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ পুরুষদের তুলনায় ব্রাহ্মণ বিধবাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। তাদের দেখাশোনা করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত বিধবাদের পুনর্বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর অবস্থাটা খানিকটা সামাল দেওয়া গেল। কিন্তু স্বজাতি ব্রাহ্মণদের মৃত্যু পরশুরামকে এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে সে এক এক করে প্রত্যেকটা ক্ষত্রিয়কে নির্মূল করতে চাইল। অতএব যুদ্ধে স্বামীহারা যেসব ক্ষত্রিয় নারী মরীয়া হয়ে পরশুরামের হাত থেকে বাঁচবার জন্য নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে পাকড়াও করার এক ঝটিকা-অভিযান শুরু করে দিল সে। তবে কয়েকটি বাচ্চা খুবই আশ্চর্যভাবে এই গণহত্যার মধ্যেও বেঁচে গেল। তাদেরই বংশধরদের দেখা মেলে আজকের প্রভু প্রমুখ সম্প্রদায়ের মধ্যে। একই ভাবে, নিশ্চয়ই এই মারদাঙ্গার শিকার হয়েছিলেন আরও কিছু মানুষ, যথা রামোশি, জিঙ্গার, তুম্বাডিওয়ালে, কুম্ভার[৩] প্রমুখ। কারণ তাঁদের মধ্যেও শূদ্রদেরই মতন নানান প্রথা আর ঐতিহ্য রয়েছে। এক কথায়, হিরণ্যাক্ষর পুত্র বলি[৪] থেকে শুরু করে ওই পরিবারের প্রতিটি মানুষকে হত্যা করে সে পৃথিবীর বুক থেকে তাঁদের মুছে দিল। এর ফলে যাবতীয় শূদ্র সর্দারের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে গেল যে ব্রাহ্মণরা নিশ্চয়ই মারণ-কুহক মন্ত্রের ওস্তাদ। ব্রাহ্মণদের মন্ত্রতন্ত্র যাগযজ্ঞ সম্পর্কে তাদের মারাত্মক আতঙ্ক তৈরি হল। তবে এইসব নির্বোধোচিত প্রয়াসে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাও ঝপঝপ করে কমে গেল। তখন ব্রাহ্মণরাই পরশুরামকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করল। ঠিক সেই সময় এক ক্ষত্রিয় সর্দারের পুত্র, তাঁর নাম রামচন্দ্র, জনক রাজার সভায় সবার সামনে পরশুরামের ধনুক ভেঙে দিলেন। স্বয়ংবরা জানকীকে জিতে নিয়ে রামচন্দ্র বাড়ি ফিরছেন, তখন পথে রেগে আগুন পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করল। রামচন্দ্রর কাছে যুদ্ধে হেরে তার মানসম্মান ধুলোয় লুটিঠে গেল। লজ্জায় সে কিছু অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে রাজত্ব ছেড়ে সপরিবার চলে গেল তাল কোঙ্কন অঞ্চলে। সেখানে অতীতের লড্ডাকর কীর্তিকলাপের কথা ভেবে অনুশোচনায় তার মন ভারী হয়ে উঠল। কাউকে কিছু না জানিয়ে সে চুপি চুপি আত্মহত্যা করেছিল।

ধোন্দিবা ঃ সে কী কথা! ব্রাহ্মণরা উঠতে বসতে তাদের সব পবিত্র বইয়ের দোহাই দিয়ে জানায়, পরশুরাম হল সাক্ষাৎ আদিনারায়ণের অবতার, তার মৃত্যু নেই। আর অপনি বলছেন সে আত্মহত্যা করেছিল! এটা কীরকম হল?

জোতীরাও ঃ বছর দুয়েক আগে আমি শিবজীকে নিয়ে একটা পোয়াড়া[৫] লিখেছিলাম। তাতে প্রথম অভঙ্গতেই ব্রাহ্মণদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলাম : 'যাও, যেখানে থেকে হোক ধরে নিয়ে এসো পরশুরামকে, তাকে শুধাও, মহা-অরিরা, যাঁরা হলেন আজকের মাং আর মাহারদের পূর্বপুরুষ, যাঁরা পরশুরামের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন কি না'। কই, তারা তো স্বয়ং পরশুরামকে কিংবা তার প্রত্যয়িত বয়ান হাজির করতে পারেনি। পরশুরাম যদি সত্যিই আদিনারায়ণের অবতার হত, আর সেই কারণে অমর হত, তাহলে ব্রাহ্মণরা নিশ্চয়ই তাকে হাজির করে শুধু আমাকে নয়, খ্রিস্টান, মুসলমান সমেত তামাম দুনিয়ার মনে প্রত্যয় জাগাত।

তাদের জাদুমন্ত্রের যদি এতই প্রতাপ, তাহলে মুসলমানদের বিদ্রোহ দমন করতে তারা কি একটুও দ্বিধা করত?

ধোন্দিবা ঃ তাহলে এবার আমি বলব, যাও ধরে নিয়ে এসো তোমাদের পরশুরামকে, আবার তাকে হাজির করা হোক আপনার সামনে। সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনার সামনে হাজির হবে। কারণ ব্রাহ্মণরা নিজেদের যতই জ্ঞানী বলুক, পরশুরাম যে তাদের ভ্রষ্টাচারী আর কলুষিত বলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রমাণ চাই আপনার? আজকাল ব্রাহ্মণরা করোলা ছেড়ে মালীদের কাছ থেকে নিয়ে চুপি চুপি গাজর খাওয়া ধরেছে, যা কিনা ওদের শাস্ত্রে বারণ।

জোতীরাও ঃ ভালো কথা। তথাস্তু।

অমর পরশুরাম ওরফে আদিনারায়ণের অবতার সমীপেষু,

হে ভ্রাতঃ পরশুরাম, ব্রাহ্মণদের বইপত্রে বলে, আপনি অমর। আপনি কোনোদিন করোলা খাওয়ার প্রথার নিন্দা করেননি। জেলেদের লাশ থেকে নতুন নতুন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করার দুঃসহ অভিজ্ঞতা আর আপনার হবে না। কারণ আপনি যাদের সৃষ্টি করেছিলেন তাদের অনেকেই আজ নিজেদের 'বিবিধ দ্যানী'[৬]

বলে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে, তাই আপনাকে আর নতুন করে তাদের কিছু শেখাতে হবে না। কেবল একবারটি এখানে এসে ওদের চান্দ্রায়ণী প্রায়শ্চিত্তর সাজাটা দিয়ে যাবেন এবং আপনার জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করে ব্রিটিশ আর ফরাসিদের সামনে অলৌকিক খেল দেখানোর অনুমতিটা দিয়ে যাবেন, যেমনটি আপনি আগে করতেন। আমি কেবল এইটুকু চাই। এবার আর মুখ লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না। আজ থেকে ছ মাসের মধ্যে আমাদের সামনে দেখা দিন; যদি দেন, তাহলে আমি তো কোন ছার, গোটা পৃথিবীর লোক স্বীকার করবে যে আপনি সত্যিই আদিনারায়ণের অবতার, ভক্তিভরে প্রণাম করবে আপনাকে। আর যদি না আসেন, তাহলে কিন্তু এখানকার মাহার আর মাংরা প্রকাশ্যে আপনার এই ব্রাহ্মণ চামচাগুলোর মুখোশ খুলে দেবেন, যারা নিজেদের নাম দিয়েছে *বিবিধ দ্যাঁনী*, যারা আমাদের মাসোবা নাম মহিষ-দেবমূর্তির পিছনে লুকিয়ে আছে। তখন তারা আর নিজেদের ঢাক বাজাতে পারবে না; তার বদলে ভিক্ষে করতে বেরোবে আর জনগণের কাছ থেকে ঢিল খাবে। শেষমেশ খিদের চোটে তারা বিশ্বামিত্রর মতন কুকুরের পা খেতে বাধ্য হবে। কাজেই আমার সামনে হাজির হয়ে ব্রাহ্মণদের এই ভয়ংকর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করুন।

আপনার দাবিগুলির সত্যতার প্রমাণ পাবার আশায় অপেক্ষারত,

আপনার বিশ্বস্ত,

জোতীরাও গোবিন্দরাও ফুলে ১ আগস্ট ১৮৭২

৫২৭ নং বাড়ি জুনা গঞ্জ পেঠ, পুণে

১। পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র। প্রচলিত কাহিনি ঃ 'একদিন মার্তিকাবর্ত দেশের রাজা গন্ধর্ব চিত্ররথকে সস্ত্রীক জলবিহারে রত দেখে রেণুকা কামস্পৃহ হয়ে পড়েন। স্ত্রীর এই মানসিক বিকার সহ্য করতে না পেরে জমদগ্নি একে একে চার পুত্রকে মাতৃহত্যার আজ্ঞা দেন। ... কনিষ্ঠ পরশুরাম পিতার আদেশ শিরোধার্য করে কুঠারাঘাতে মাতার শিরশ্ছেদ করেন। ...একদা জমদগ্নির পুত্রগণ অন্যত্র গমন করলে সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়রাজা কার্তবীর্য আশ্রমে এসে সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ ও আশ্রমের জিনিসপত্র বিপর্যস্ত করে প্রস্থান করেন। পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে [কার্তবীর্যকে] বধ করেন। এর ফলে কার্তবীর্যের পুত্ররা আশ্রমে এসে তপোনিরত জমদগ্নিকে অতর্কিত আক্রমণে বধ করে। পরশুরাম ... একাই কার্তবীর্যের পুত্র ও তাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে নিষ্ট করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। পরশুরাম ... একাই কার্তবীর্যের পুত্র ও তাদের অনুগত ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে বিনষ্ট করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এইরূপে একুশবার তিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন...'। (সুধীরচন্দ্র সরকার, *পৌরাণিক অভিধান*, এম সি সরকার, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৮৪)

২। মহারাষ্ট্রর কোঙ্কণ উপকূলের নিম্নভূমি অঞ্চল।

৩। জিঙ্গার ঃ যারা ঘোড়ার জিন বানায়; তুম্বাড়িওয়ালে ঃ যারা ওষুধ তৈরি করে; কুম্ভার ঃ কুমোর।

৪। বাণাসুরের কন্য ঊষার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নর।

৫। বিশেষ জনপ্রিয় প্রাচীন মরাঠি লোক-গাথাশৈলী যাতে ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা সামাজিক বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

৬। বিবিধ দ্যাঁনী ঃ বহুবিদ পণ্ডিত। কথাটা ব্রাহ্মণ-পরিচালিত বিবিধ দ্যাঁন বিস্তার নামক পত্রিকার প্রতি ব্যঙ্গ। ঊনিশ শতকে মহারাষ্ট্রে এটি খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উ মা

ত্রয়োদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার, সন্ধ্যে ৫টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ইন্দুমতী সভাগৃহে ত্রয়োদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।

বিষয় :

'বিজ্ঞানীর নৈতিকতা বনাম ভারতীয় জ্ঞানধারা'

বক্তা : অধ্যাপিকা রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবেশ অবাধ

তন্তর মন্তর

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

মন্ত্রের সঙ্গে তন্ত্র শব্দটি জোড়া। যেমন গাড়িঘোড়া, চা-টা, ফল-মূল ...। আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনে মা ... গান আছে। পুরোহিতরা, যাঁরা পুজো-আচ্চা করেন, ওরা তান্ত্রিক নন, তবে ওদের পূজা পদ্ধতির মধ্যে তন্ত্র মিশে থাকে। পুজো শুরু করার সময় জলশুদ্ধি আসনশুদ্ধি ইত্যাদি করার পরই ভূতাপসরণ করতে হয়। এটা একটা তান্ত্রিক ক্রিয়া। পুরোহিত দর্পণে ভূতাপসরণ কি ভাবে করতে হয় শুনুন। 'অতঃপর পূজক দিব্য দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করিয়া 'ফট' মন্ত্রে জলদ্বারা বেষ্টন করিয়া আকাশস্থিত বিঘ্নকে বামপাদের পার্ষ্ণি দ্বারা মৃত্তিকাতে বারত্রয় আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূর করিয়া ফট মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া বিকির হস্তে লইয়া বক্ষ্যমান মন্ত্র পাঠপূর্বক উহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবেন।' বক্ষ্যমান মন্ত্রটি এবার দেয়া আছে সেটা উল্লেখ করছি না। এবারে বলি— পার্ষ্ণি মানে পায়ের গোড়ালি, আর বিকির হল সাদা সরষে, ছাই, আতপচাল এবং দূর্বার মিশ্রণ। বলে না, সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়াতে হয় ...। সেই সর্ষে। সঙ্গে ছাই-টাই। এবং ভূত তাড়াবার প্রধান মন্ত্র হল ফট্ আমরা কাউকে তাচ্ছিল্যের সুরে বিদায় নিতে বললে বলে নাকি না 'যা-ফোট' —এটা জানি না ভূতাপসরণ মন্ত্র থেকে এসেছে কি না। তান্ত্রিকদেরই একটা লৌকিক রূপ ওঝা। ওঝারাও ভূত ছাড়ায় বা ভূত তাড়ায়। ওঝাদের যেহেতু পুরোহিত দর্পণ ধরনের ওঝা দর্পণ নামে কোনো লিখিত বই নেই, তাই ওঝাদের ভূত তাড়াবার পদ্ধতি এবং মন্ত্র অনেক রকম। অনেক বৈচিত্র্য। এটা গুরুমুখী। গুরুর কাছ থেকে যা শেখে সেটাই বলে। এবং একেক জেলায় একেক রকম। ভারতের বিভিন্ন জেলাতেও বিভিন্ন রকম। ওঝাদের মধ্যে হিন্দ-মুসলমান, এমনকি খ্রিস্টানও আছে। একটা মজার কথা বলি, যিশুমেলায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। যিশু কীর্তন হয় খোল কর্তাল বাজিয়ে। ওদের একজনের কাছে শুনেছিলাম এ গাঁয়ের কেরেস্তানিরা সব রোমাই কার্তিক, আর ও গাঁয়ে চার ঘর পেস্টান কেস্টান। অনেক পরে তপন রায়চৌধুরীর বাঙালনামা পড়ে বোঝা গেল রোমাই কার্তিক মানে রোমান ক্যাথলিক, পেস্টান কেস্টান তা হলে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। এই আমার ভারতবর্ষ। যা বলছিলাম খ্রিস্টানদের মধ্যেও ওঝা আছে। কারণ সারা ভারতবর্ষে ভূত আছে। উইচ নেই। নানারকম ভূত। ব্রহ্মদত্তি, মামদো, মেছোভূত, গেছোভূত, স্কন্দকাটা; নারীবাদীরা রাগ করবেন না, নারীভূতও আছে—পেত্নি, শাকচুন্নি, নিশি, পেঁচি। ডাইনিরা অবশ্য ভূত নয়। পরে আসছি। এ ছাড়া মুসলমানদের কাছে ভূত নয়, জ্বিন হল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভূত যে আছে তাতে সন্দেহ নেই, সরকারের অনেক টাকা পয়সাই সাত ভূতে খায়। আবার ভূত তাড়াবার যে সরকারি সর্ষে, তাতেও ভূত থাকে। এই সব ভূত সিবিআই-ইডি তাড়াতে পারছে কই।

কথায় কথায় দূরে সরে এসেছি। কথা হচ্ছিল ভূত তাড়াবার মন্ত্রের বৈচিত্র্য নিয়ে।

হুগলি জেলার অনেক ওঝারা বলে— অষ্টবজ্র করলাম। এক অষ্ট দেবতার বরে অষ্টবজ্রের তেল নিলাম শক্তির শক্তি ধরে। অগ্নিবান সৃষ্টি হল ব্রহ্মার দোহায় হান হান শব্দে বান চলে আকাশ ছেয়ে ইত্যাদি পড়ে হাড়ির জল ছিটিয়ে তেত্রিশ দেবতার হুকুম — ভাগ ভাগ যা চলে যা ... যার দেহ থেকে ভূত ছাড়ানো হচ্ছে তার নাম ইত্যাদি বলতে বলতে জল ছেটানো হয়।

কোথাও কোথাও আবার ঝাঁটা দিয়ে মারা হয়।

পয়লা বৈশাখ শান্তিপুরের কাছে একটা গ্রামে ভূতের মেলা হয়। ওখানে টাঙ্গাইল থেকে ভূমিচ্যুত হয়ে আসা তাঁতিরা থাকেন। দেশভাগের আগে ওঁরা ওঁদের দেশে গাজনের সময় শিবের সঙ্গে শিবের চেলা ভূতপ্রেতদেরও মূর্তি বানিয়ে পুজোটুজো করে মজা করত। ওঁরা সেই মজাটা এধারেও নিয়ে এসেছেন। নানা রকমের ভূতের মূর্তি গড়া হয়, যাকে বলে 'কল্পনা-রগড়'। আবার এই দিন ওঝাদেরও আগমন হয়। ভূতে ধরাদের নিয়ে আসা হয়। ভূতে ধরারা অধিকাংশই মহিলা বা বৃদ্ধ। ভূত ছাড়ানোর পুরো প্রক্রিয়াটা ক্যাসেটবন্দী করেছিলাম, কিন্তু সেই সব ক্যাসেট এখন নষ্ট হয়ে গেছে। স্মৃতি থেকেই বলছি। *ওং হ্রিং হ্রিং ক্লীং বাবা ভূতনাথ অমুককে ভূতে পাইছে, বাবার দোহাই অরে বিদায় কর, টাইন্যা লও, ভক্তরে নিজের কোলে স্থান দেও। ওং হ্রিং ক্রিং বিল্যপত্র পুষ্পাঞ্জলি ধুতরা ফুল, গঞ্জি পাতা মড়ার মাথার খুলি — যা রে তুই বিদায় হ। শিবের কাছে যা। স্তবানুজাতাহং ভৈরবী কালী সহায়* ... অনেকটা এরকম।

বাংলা একাডেমি, ঢাকা লোকসাহিত্যের নানারকম বই প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে একটা খণ্ডই হল মন্ত্র।

এখানে ভূত তাড়ানোর মন্ত্রও আছে। ঢাকা জেলা থেকে পাওয়া।

বিছমিল্লা বলিয়া মুখে/তুলিয়া লইলাম তোরে/বিছমিল্লা মন্ত্রের জোরে/একে একে একে পড়ে পানি/আল্লাহ আহাদ/দ্বিতীয় পড়ে পানি/দ্বিতীয়ার বাদ/তিনে পড়ে পানি/পয়গম্বর পীর/চারে পড়ে পানি/পাচে পড়ে পানি/পাক পাতঞ্জন/ছয়ে পড়ে পানি/পীর সোনারতন — এইভাবে নয় পর্যন্ত পানি পড়া করে সেই পানি ছিটিয়ে জ্বিন তাড়ানো হয়।

শ্রীহট্ট জেলার পেত্নি ঝাড়ন মন্ত্রটা এরকম — পেত্নি ঝাড়ন পেত্নি ঝাড়ন/পেত্নির মুখে ছাই মারি বান/ করি টান/আর রক্ষা নাই/দিলাম মন্ত্র বাড়ি/জলদি যা দ্যাশ ছাড়ি/না আসবি ফিরিয়া/দোহাই কালীর/দোহাই বাবা বাবা মহাদেব।

এরই একটু রকমফের হয়তো মেদিনীপুর বা কুচবিহারে। লক্ষ্য করার বিষয় হল গ্রাম্য ওঝাদের মন্ত্র সংস্কৃত নয়, আরবিও নয়। একেবারে মাতৃভাষা।

এই যে সব ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাইনি-জ্বিন—হঠাৎ এসব নিয়ে কথা বলছি কেন?

বলছি একটা আশঙ্কা থেকে। আমরা সবাই জানি আদি ভয় থেকেই এইসব ভূতপ্রেতের জন্ম। মৃত্যুর পর সবই কি শেষ? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য, প্রকৃতির নানা অজানা রহস্য থেকে এসব অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করেছে আদি মানুষ। মানুষ এগিয়েছে, অনেক রহস্যের উত্তর পেয়েছে, কিন্তু সব রহস্যের সমাধান তো হয়নি আজও। মানুষের উন্নততর বোধবুদ্ধি মানুষকে এইসব ভৌতিক-দৈবিক শক্তিকে অস্বীকার করতে ইন্ধন দিয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিই আসল এইসব শিখিয়েছে। কিন্তু যদি এখন আবার ভূত পড়ানোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়, ওঝাগিরির ইস্কুল হয়, তবে কী হবে? ওঝাগিরি শেখানোর প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল হয়নি এখনো, তবে পৌরোহিত্য শেখানোর স্কুল হয়েছে, বৈদিক জ্যোতিষ শেখানোর স্কুল হয়েছে। শুনছি ইউজিসি-কে বলা হচ্ছে মন্ত্রশক্তি নিয়ে আধুনিক গবেষণার পথ প্রশস্ত করতে। একটা শক্তি সব সময়েই থাকে—সেটা পিছুটানের শক্তি পিছনে টানে। অন্য শক্তি এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— আমরা চলি সমুখ পানে/কে আমাদের বাঁধবে,/রইল যারা পিছুর টানে/কাঁদবে, তাঁরা কাঁদবে।

লিখেছেন— জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে/কেবলিপাঁদ পাতবে/কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

এই ভূত-ডাইনি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা, একটা ফাঁদ। প্রগতি বিরোধী ফাঁদ।

এই যে মন্ত্র, এই মন্ত্রই যে কত রকম। ভূত বিশ্বাস যে কত রকম, তন্ত্রের নামে কী হচ্ছে, মানুষের কত রকমের বিশ্বাস এই সব বলার জন্যই তো এত কথা।

ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যার বিচিত্র জনগোষ্ঠী। বিচিত্র রকম সব জীবন প্রণালী ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

মন্ত্রে ভূত তাড়ানো শুধু কেন, সাপের বিষ ঝাড়া, আমাশা ভালো করা, জ্বর কমিয়ে দেয়া শুধু নয়, স্ত্রীলোক বশীকরণের মন্ত্রও হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে যাঁরা মধু সংগ্রহ করতে যান, ওরা বাঘের মুখ বন্ধ করার মন্ত্রও পড়েন। দেখা যায় এইসব মন্ত্রে যেমন মনসার নাম আছে, ফতেমার নামও আছে। হনুমানও আছে, পয়গম্বরও আছে। একই মন্ত্রে মনসা এবং ফতেমাকে দেখি বাঘকে খিলেন করার মন্ত্র।

একটা বশীকরণ মন্ত্র শোনাবো নাকি?

খ্যাং খ্যাং খ্যাংগার কংগারুক/ ফুটুক ফাড়ুক আম্‌কো তরে মরুক/ জাহাংগীর সরু মচ আদিরস/তেরা মুখ দিয়ে করে কেতনা কস/ হিতাকে আইয়ে কইয়ে তেরা/তেরা ভাটি চালিয়ে ভোরা/ জঃ সয়ম জঃ সয়ম কুথাকে/তেনারি মোর সইয়া/ তব তল হামারি কালিজা পরি রয়/কার আজ্ঞা?/ঝেটু সিং কো আদত/কার আজ্ঞা?/খোন্দকার কি আজ্ঞা।

এটা পুর্ণিয়া জেলার। কিছুটা হিন্দি, সাঁওতালি মেশানো বাংলা। এখানে ঝেটু সিং বা খোন্দকারের নাম আছে। ওরা সম্ভবত এই মন্ত্র পড়া তান্ত্রিকের গুরু বা পূর্বজ।

আগেই বলেছিলাম হিন্দু পূজা পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে তন্ত্র মিশেছে। পূজাস্থল থেকে ভূত তাড়ানো দিয়ে শুরু করেছিলাম, কথায় কথায় এতদূর চলে এলাম। এবার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র এবং কায়দাটা পুরোহিত দর্পণ থেকে বলি।

লেলিহান মুদ্রায় নিজের হৃদয়ে দূর্বা ও আতপ তণ্ডুল ধারণ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওং আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং শং/যং সং হোং সং শ্রী অমুক দেবতায়াঃ/প্রাণা ইহ প্রাণা। ওং আং ক্রোং রং ... এরকম বলে শ্রী অমুক দেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ... এইভাবে কতগুলো ধ্বনি বলে— সংস্কৃতে বলা হচ্ছে—আমি প্রাণ দিলাম। হে দেবতা তুমি এখানে থাকো...।

পিছুবাদীরা বলেন এই যে সঠিক উচ্চারণে ওং, আং, ক্রীং, ক্লীং ইত্যাদ শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন তৈরি হয় একটা তরঙ্গ শক্তি। এই শক্তিই দেবতার মূর্তি বা ঘটের মধ্যে অবস্থান করছে।

এখানেই মুস্কিল। সঠিক উচ্চারণ মানে কী? এক এক জনের গলার স্বরযন্ত্র এক এক রকম। এ জন্যই মানুষের কণ্ঠস্বর

আলাদা হবে। উচ্চারণও আলাদা হবে। বলা হয় ওম্ শব্দটি নাভি থেকে বের হয়। ফিজিওলজি বলে পেটের মধ্যে কোনও শব্দ উৎপন্ন হয় না। পেটের মধ্যে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা নিঃসরণের জন্য অন্যত্র শব্দ উৎপাদিত হয়। ওং-কার ধ্বনি তৈরি করে ফুসফুসের বাতাস, স্বরযন্ত্র এবং গল বিবরের সাহায্যে। ওংকারের মধ্যে একটা গম্ভীর নাদ ধ্বনি অবশ্যই আছে। এবং নাদধ্বনি মানসিক পরিবর্তনে এবং চিত্ত শাসনে সাহায্য করতেই পারে, কিন্তু ওংকার ধ্বনি দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায় না, বা গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে রোগব্যাধি কমানো যায় না। এই যে পূজা পদ্ধতি, এর মধ্যে পরতে পরতে তান্ত্রিক আচার মিশে আছে। হিন্দুদের শ্রাদ্ধমন্ত্রে তন্ত্র আছে, অথর্ববেদে অনুসারীদের যজ্ঞেও আছে।

এবারে তন্ত্রের প্রসঙ্গে আসি। তন্ত্র ব্যাপারটা কী?

তন্ত্র এমন একটা ক্রিয়াকলাপ, যা কিছু উদ্দেশ্যসাধনের জন্য করা হয়। এটা বৈদিক যাগযজ্ঞের বাইরে অন্য কিছু ক্রিয়া। পারস্যে অগ্নি উপাসনা হত। বৈদিক যুগে ভারতের বেশ কিছু মানুষ আগুনকে মনে করত দেবতালোকের সঙ্গে সংযোগকারী শক্তি। অগ্নিকে আহুতি দিত। সেই সঙ্গে কিছু বন্দনা ছিল, কিছু প্রার্থনা ছিল, ছন্দোবদ্ধ। ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হল অন্য কিছু ক্রিয়াকলাপ এবং এমন কিছু ধ্বনির উচ্চারণ, যার কোনো অর্থ নেই। হতে পারে ভারতের আদিমানুষদের কাছ থেকে পাওয়া।

এমনি সংস্কৃতে তন্ত্র শব্দটি 'তন্' ধাতু থেকে এসেছে। যার মানে হচ্ছে বিস্তার। একটা সংস্কৃত শ্লোকে বলা আছে তন্ত্র হল সেই শাস্ত্র যা দিয়ে জ্ঞানের বিস্তার করা হয়। এটাকে জ্ঞান যাঁরা বলছেন বলতেই পারেন, কারণ জ্ঞান তো অনেকরকম। চৌর্য্য শাস্ত্র একটা শাস্ত্র, এবং এই শাস্ত্রেও জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন।

বেদের প্রথম দিকটাকে বলে নিগম এবং শেষের দিকটাকে বলে আগম। অথর্ববেদ হল পরের দিককার বেদ। এখানে যাগ-যজ্ঞ-আহুতি ছাড়াও কিছু প্রক্রিয়ার কথা নাকি বলা আছে, যা দিয়ে কিছু কিছু অলৌকিক কাজকর্ম করা যায়। এজন্য এই শাস্ত্রে পটু মানুষদের আগমবাগীশও বলা হয়।

বাংলায় কালীপূজার পদ্ধতি চালু করেছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। উনি তন্ত্রসার গ্রন্থটি রচনা করেন। উনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জন্মেছিলেন। তার আগে চণ্ডী, দুর্গা এইসব শক্তিদেবীর ধারণা ছিল, কিন্তু কালীর স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তন্ত্রে শরীরের একটা ভূমিকা আছে। তন্ মানে শরীর। যা থেকে তনু কথাটা এসেছে। তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার। শরীরকে বিস্তার করা হয় তন্ত্রে মানবশরীরে কতগুলি চক্র আছে বলে ভাবা হয়। একেবারে কোমরের কাছে, যেখান থেকে মেরুদণ্ড শুরু, সেখানে আছে মূলাধার চক্র, তার একটু উপরে স্বাবিষ্ঠান চক্র, নাভির কাছাকাছি, হৃদয়ের কাছাকাছি হৃদচক্র। গলায় বিশুদ্ধচক্র, দুই চোখের মাঝে আজ্ঞাচক্র, এবং মাথায় সহস্রার চক্র। কল্পনা করা হয় মূলাধারে সাপের মতো কিছু একটা থাকে, যাকে কুণ্ডলিনী বলে। এই কুণ্ডলিনীকে মেরুদণ্ড দিয়ে উপরের দিকে উন্নীত করতে হয়। একেবারে উপরে আছে সহস্রার। এখানে উচ্চচেতনা, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়।

শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী আমরা জানি, মেরুদণ্ডের দু পাশে দুটি নিউরোন প্রণালী আছে,সুতোর মতোই—তন্ত্রে এর নাম হাড়া এবং পিঙ্গলা। শরীরের সমস্ত নার্ভ মেরুদণ্ডের দু পাশ দিয়ে স্পাইনাল কর্ডে মিশেছে। স্পাইনাল কর্ড চলে গেছে মস্তিষ্কে। ভারতের প্রাচীন শরীরবিদরা নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ করে এসব দেখেছিলেন। এর পরের ব্যাপারগুলোই গোলমেলে। কুল কুণ্ডলিনীকে উপরের দিকে তোলার ব্যাপারটা। এটা করতে গিয়ে একজন সাধন সঙ্গিনীর কথা বলেন কয়েকটি দল। ভাবা হয় মূলাধারে কাম ভাব অধিষ্ঠান করে। সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে মূলাধার থেকে স্বাধীষ্ঠান এবং স্বাধীষ্ঠান থেকে ক্রমশ আজ্ঞাচক্র হয়ে সহস্রার চক্রে নিয়ে যেতে হয়। তখন সিদ্ধি। এজন্য যোগ সাধনা দরকার। আধুনিক কালে যাকে কায়দা করে বলা হয় ইয়োগো বা যোগা। নানাবিধ শারীরিক ব্যায়াম ও কুণ্ডলিনী উত্থানের সহযোগী হয়। এই উত্থানের জন্য দরকার হয় শক্তি। শক্তির উৎস হলেন কালী। তাই তান্ত্রিকরা অনেকেই কালী সাধক।

আবার বৌদ্ধদের নানা ভাগের মধ্যে একদল আছেন বজ্রযানী। এঁদের কিছু দেবী আছেন—যেমন বজ্রযোগিনী, তারা ইত্যাদি। তারাদেরও নানা ভাগ— লীলাতারা, রক্ততারা, শুক্লতারা, বজ্রতারা ইত্যাদি। বজ্রযানীরা তারা মন্ত্র জপ করে — ওং তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা, আবার হিন্দু তারা তান্ত্রিকরাও এই একই জপমন্ত্র বলে। হিন্দুকালী আর বৌদ্ধতারা কখনো এক হয়ে যায়— কালীতারা ব্রহ্মময়ী যজ্ঞে। তারাপীঠে তারা দেবী আছে। আবার দশমহাবিদ্যার একজন হলেন তারা।

আবার কী বিচিত্র দেখুন, সেই আদিম ফার্টিলিটি কাল্ট-এর সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে তন্ত্র। ধরিত্রী উৎপাদন করে। নারীও উৎপাদন করেন। সন্তান উৎপাদন। নারীদের মধ্যে এই অনন্য শক্তির জন্যই শক্তিদেবীর আরাধনা। কামাখ্যা একটা শাক্ত পীঠ। এখানে সতীর যোনি পড়েছিল ভাবা হয়। এবং দেবী ঋতুমতীও হন। কখন? বর্ষাকালে। বর্ষাকালেই তো ধরিত্রী

রূপে-রসে ভরে ওঠেন। মাটির বুকে শস্য আসে। তাই কামাখ্যা হয়ে গেল তন্ত্রের একটা পীঠস্থান। কামাখ্যা সিদ্ধ তান্ত্রিকদের গ্রেড আবার তারাপীঠ সিদ্ধদের চেয়ে উঁচুতে। এরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ এসব তো পারেই, অনেকে বিশ্বাস করে আজও ওরা নাকি মানুষকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে। কামাখ্যা নিয়ে কিছু মানুষের মধ্যে একটা অন্ধবিশ্বাস আছে, নইলে কেন প্রথম শ্রেণীর খবর কাগজে প্রচুর পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় 'কামাখ্যা তন্ত্রে পারদর্শী স্ট্যাম্প পেপারে লিখে ২৪ ঘণ্টায় বশীকরণ, বিচ্ছেদ ঘটানো ও জোড়া লাগানো, শত্রুনাশ— কামাখ্যা সাধক, উগ্রতারা ও রক্তচামুণ্ডার আশীর্বাদধন্য অমুক মামলা, ব্যবসা, শত্রুতা সহ সবরকম সমস্যা সাধনে, জনকল্যাণ করিয়া থাকি।'এই তান্ত্রিকদের হিন্দু হতেই হবে তেমন নয়। মুসলমান তান্ত্রিকও আছেন, তারা সাধারণত জ্বিন বশ করেন, জ্বিন চালনা করেন।

আমি উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর অঞ্চলে এক বিখ্যাত জ্বিন সাধকের কাছে ওদের কাজ কারবার বোঝার জন্য খদ্দের সেজে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, উনি জ্বিন পোষেন। ওর অনুগত সাতটা জ্বিন আছে। জ্বিনদের দিয়েই উনি সব কাজটাজ করিয়ে নেন।

এর আগে ছোট করে বলে নি জ্বিন কী বস্তু।

জ্বিন কথাটি আরবি। আক্ষরিক মানে হল অদৃশ্য, সুপ্ত, গোপন, এরকম কিছু। ইসলাম পূর্ব আরবেও জ্বিন বিশ্বাস ছিল। ভাবা হত এরা অদৃশ্য হলেও নানারকম রূপ নিতে পারে। ওদের অনেক ক্ষমতা। ওরা ফোঁড়া হয়ে গায়ে ফুটে যেতে পারে, গিরগিটি হয়ে দূর থেকে রক্ত চুষে খেতে পারে আবার পোকা হয়ে কারুর বেগুন ক্ষেতও নষ্ট করে দিতে পারে। একজন ধার্মিক নামাজি মুসলমান আমাকে বুঝিয়েছিলেন নামাজ পড়ার আগে, অজু করার সময় নাকের দুই ছ্যাদা পানিতে পরিষ্কার করা জরুরি, কারণ ওই গর্তে জ্বিন লুকিয়ে থাকে। কোরান বলছে জ্বিন জাতিকে সৃষ্টিকর্তা তৈরি করেছিল মানুষ সৃষ্টির আগে। এই জ্বিনরা মানুষদের দেখতে পায় না।

রোবট সার্জারি তো শুনেছেন। জ্বিন সার্জারি শুনেছেন? একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম, জ্বিনের সাহায্যে অলৌকিকভাবে আরামদায়ক খৎ না করালে হয়।

টেলিভিশনের ব্যবসাটা এখন একটা লাভজনক ব্যবসা। খুব বেশি টাকা মূলধন লাগে না। ওখানে জ্যোতিষী তান্ত্রিকরা টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করে। পশ্চিমবাংলায় অন্তত তিরিশটি চ্যানেল আছে, যারা জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ফেংসুই, বাস্তুবিদদের স্লট ভাড়া দেয়। ওখানে বিচিত্র সব পাবলিক আসে। কারুর গলায় সাতলহরি রুদ্রাক্ষ, কারুর মাথায় মুকুট, কেউ সামনে একটা করোটি নিয়ে বসেন, কেউ কালো কুচকুচে পোশাকে আসেন, উনি কালা যাদু করেন। মুখে দাড়ি, পিছনে আরবিতে কোনো আয়াত; উনি আবার 'জ্বিনচালা বিশারদ'। কপালে অনেকটা সিঁদুর লেপন করা নারী তান্ত্রিকও আছেন।

তারা কী সব বলে চলেছেন। লেবু নেগেটিভ এনার্জি টেনে নেয়, মধুর উপরে তিনবার একটা গুপ্ত মন্ত্র বলে ফুঁ দিয়ে খেলে রতিশক্তি দশ গুণ বাড়বে। সেই গুপ্ত মন্ত্রটি উনি চেম্বারে গেলে বলে দেবেন। শ্রীযন্ত্রম কস্‌মিক এনার্জি বের করে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে দেয়। কালিজার ভিতরে থাকে মানুষের আত্মা। কালিজাকে এমন 'তরিবত' করে দেয়া হবে যাতে আত্মা সুখে থাকে। আত্মা সুখে থাকলেই মানুষ সুখে থাকে। এমন একটা ম্যাগনেট তাবিজ দেয়া হবে, যেটা শরীরের সমস্ত 'পইজন' শোষণ করে নেবে। আংটির পাথর মানে কালার থেরাপি। মহাকাশ থেকে ঠিক প্রয়োজন মতো কালার ওয়েভ টেনে নিচ্ছে। কী যে পজিটিভ এনার্জি, কি যে নেগেটিভ এনার্জি, কালার ওয়েভ কী বিজ্ঞানীরাও জানে না। এরকম 'বৈজ্ঞানিক' জার্গন ব্যবহার করেন ওঁরা, কিছু শব্দ। ভলভনি যার মানে ওঁরাও হয়তো জানেন না।

একটা পুরনো পঞ্জিকা বের করি। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ মানে ইংরিজি ১৯৬৯ সালের। দেখুন ওখানেও ইলেকট্রিক শব্দটার একটা মোহ ছিল। এখন যেমন কম্পিউটার। আজকাল অনেক জ্যোতিষী ল্যাপটপ নিয়ে বসেন। তারপর দেখুন ঐন্দ্রজালিক সুগন্ধি। একটা রুমালে মন্ত্রপুত ওই সুগন্ধি কারুর সামনে নাড়িয়ে দিলে সে আপনার শরণাগত হয়ে যাবে বশীকরণ আংটি। সম্মোহিনী রুমাল মেধাবী পিল্‌স। মেধা শতগুণ বৃদ্ধি।

কী পরিবর্তন হল এত দিনে? সেই প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন, সেই মিথ্যা প্রচার, সেই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গলার শির ফুলিয়ে বলা, যেমন চলছিল তেমন চলছে। অথচ এসবের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে আইন আছে। ১৯৫৪ সালেই এটা তৈরি হয়েছিল নেহরুর আমলে। এখানে বলা হয়েছিল এমন কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচার করা যাবে না যা 'ম্যাজিকাল'। ম্যাজিকাল বলতে বলা হয়েছিল মন্ত্র, এমন কোনো বস্তু যার অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলা হয়— যেমন তাবিজ, পাথর, মূর্তি ইত্যাদির প্রশংসা করা যাবে না। বিক্রি করা যাবে না। নারীদের গর্ভপাতের পক্ষে, যৌনতা বৃদ্ধির জন্য, কুষ্ঠ রোগ উপশমের জন্য, টাকে চুল গজানোর জন্য ... এরকম ৫৪টা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যা নিয়ে কোনোরকম অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করা যাবে না। এই আইনভঙ্গকারীদের ছ মাস অব্দি কারাদণ্ড দেয়া যায়, কিম্বা জেল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনদিন এই আইন

প্রয়োগ করা হয় নি। প্রবীর ঘোষ একবার মামলা করেছিলেন বলে শুনেছি, কিন্তু শুনানি কেবল পিছিয়েছে। এই আইনের আরও অনেক দুর্বলতা আছে। এই আইন উপযুক্ত সংশোধন করে আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য লড়াই করেছিলেন পানেসারে, কালবুর্গি, দাভোলকারদের মতো সমাজকর্মীরা। দাভোলকার বলেছিলেন, ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডি অ্যাক্ট বেশ দুর্বল। উনি একটা নতুন খসড়া তৈরি করেছিলেন মহারাষ্ট্রে। ২০১৩ সালে তাঁকে খুন হতে হয়। দাভোলকারের হত্যাকণ্ডের পর গোবিন্দ পানসারে তাঁর মশাল হাতে তুলে নেন। ২০১৫ সালে তাঁকেও খুন হতে হয়। এম এম কালবুর্গি, যিনি কর্ণাটকের মানুষ, অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, উনি জাতপাত বিভেদ, নানারকমভাবে মানুষকে পিছিয়ে পড়ানো, গণ্ডীবদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তাঁকেও খুন হতে হয়েছে ২০১৫ সালেই। এঁরা নিজের জীবন দিয়েছেন এই লড়াইয়ে। চিন্তার মুক্তির লড়াইয়ে।

আজ এই কালো সময়ে এঁদের স্মরণ করি, শ্রদ্ধা জানাই। কেউ এসবে যদি বিশ্বাসী হন, হতেই পারেন, এসবের পক্ষে বিজ্ঞান খাড়া করবেন না। আমরা সাংবাদিক হিসেবে এই ওয়াচ টাওয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে শুধু বলতে পারি — সাবধান...। হুঁসিয়ার ভাই হুঁসিয়ার।

হঠাৎ করে গত কয়েক বছর ধরে একটা প্রবণতা দেখছি কেবল তন্ত্রমন্ত্র-ভূত-প্রেতের বই বেরুচ্ছে। কে কি লিখবেন, কে কি পড়বেন সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার। তন্ত্র ব্যাপারটা একটা জটিল বিষয়, আগেই বলেছি। এর মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এ সবে বিশ্বাস-অবিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এর মাধ্যমে যদি ব্ল্যাক ম্যাজিককে প্রশ্রয় দেয়া হয়, সাংবিধানিক আইন—ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডি অ্যাক্টকে অমান্য করা হয়, তবে সেটা বে-আইনি এবং অসাংবিধানিক।

এমন লেখাও পড়েছি, যা খুব বিক্রি হয়েছে, যেখানে এক শবসাধক শবের উপর ভৈরবীর সঙ্গে মৈথুন করছে। খুবই রগরগে ভাষায় লেখা। এসব সাহিত্য কিনা তার ফতোয়া দিতে পারি না, তবে এগুলো চিত্তকে কোনরকম প্রশান্তি দেয় না। চিত্ত প্রসার ঘটায় না। ভূত কিংবা অশরীরীদের নিয়ে অনেক লেখাই হয়েছে। কালিদাস, সেক্সপীয়ার থেকে ত্রৈলোক্যনাথ, পরশুরাম, শীর্ষেন্দু অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু সেইসব লেখা পড়ে এটা মনে হয় নি যে ভূত পেত্নি সত্য, ব্রহ্মদৈত্য সত্য।

কিছু লেখা পড়ে যেন মনে হয় অলৌকিক কাণ্ড কারখানাগুলি সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। আপত্তিটা এখানেই।

উমা

এদেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ মনোরোগবিশেষজ্ঞ

ডা. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের কথা

সমীরকুমার ঘোষ

পঞ্চম ও শেষ পর্ব

মনোরোগ নিয়ে কাজকর্ম, পড়াশোনা, চর্চা, আলোচনাচক্র আয়োজনের পাশাপাশি নানা বিষয়ে লিখেছেন অনেক বই। যাকে দুভাগ করা যায়। এক, মনস্তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বিষয়ক এবং দুই সাহিত্য। ওঁর সবচেয়ে উল্লেখ্য বই 'পাভলভ পরিচিতি।' প্রথমে ছাপা হয়েছিল চার খণ্ডে। নাভানা থেকে। ১৯৭৬ সালে। পরে ওখান তেকেই দু খণ্ডে। বর্তমানে পাওয়া যায় এক খণ্ডে। প্রকাশ হ্যারিসন রোডের (মহাত্মা গান্ধী রোড) পাভলভ ইনস্টিটিউট থেকে। এই অখণ্ড সংস্করণ নিয়ে কতগুলো অপ্রিয় প্রশ্ন ওঠে। লেখক প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর লেখার ভঙ্গি বদলে দেওয়া, যথেচ্ছ কাটছাঁট করা, বিষয় এদিক-ওদিক করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো যায় কি? সম্ভবত যায় না। পরিমার্জনের নামে যা করা হয়েছে, তা অমার্জনীয় অপরাধ। যাঁরা নাভানা সংস্করণ পড়েন নি বা হয়ত পড়বার সুযোগ পাবেন না, তাঁদের জন্য অপ্রিয় সত্যটা নথিবদ্ধ করার জন্য প্রশ্ন তোলা হল। এছাড়াও ধীরেনবাবুর গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ' ও 'বিচ্ছিন্নতা ও বর্তমান: বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ ২য় খণ্ড।' বিচ্ছিন্নতা নিয়ে ভাবনাতেও তাঁকে এদেশে পথিকৃৎ বলা যায়। লিখেছেন 'বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গ', 'মনের অসুখ' 'কৈশোর ও তার সমস্যা', 'আ সাইকিয়াট্রিস্ট রিভিউজ ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ন', 'মনোরোগ ও মনোবিদ', 'শৈশব ও তার সমস্যা', 'চিন্তাভাবনা: বিশ শতকের শেষ দশক' ইত্যাদি মন ও মনোরোগ সংক্রান্ত বই। বেশ কিছু নাটক লিখেচেন। লিখেছেন বাংলায় প্রথম সাইকোড্রামা— 'স্ত্রী চরিত্র', মরুঝঞ্ঝা', 'অপারেশন ফাউস্টাস'। ওঁর লেখা নাটকের মধ্যে অন্যতম উল্লেখ্য 'লেনিন সরণী'। এছাড়া আছে 'দুর্ভাগা দেশ ও অন্যান্য নাটক'। লিখেছেন 'পত্র উপন্যাস', 'কবিতা সংকলন'। 'প্যারেন্ট'স গাইডেন্স ক্লিনিক' ছিল ওঁর অসফল উদ্যোগ।

১৯৯৭-এর গোড়ায় মস্তিস্কে রক্তক্ষরণে (সাবডুরাল হেমাটোমা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২১ অক্টোবর ১৯৯৮, সকাল সওয়া ছটায় ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হন কিংবদন্তী মনোবিদ ও মনোরোগ চিকিৎসক।

উমা

বিজ্ঞান আর তার মুখোশ

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

তখন ক্লাস ফোর কি ফাইভ। সেদিন এক প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছি। প্রায়ই যেতাম। খুব ছোটবেলা থেকেই। নিজের বাড়ির সঙ্গে প্রায় কোনও তফাতই ছিল না সেই বাড়ির। অনেক রকমের বই ছিল সেখানে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পছন্দসই একখানা বই মুখে দিয়ে কত দিন যে কাটিয়েছি সেখানে তার কোনও হিসেব নেই। সে বাড়ির যিনি গৃহস্বামী তিনি খুব পড়াশোনা করতেন। বহুলাংশে স্বশিক্ষিত মানুষটির কত বিষয়ে যে গভীর আগ্রহ ছিল। তার পাশাপাশি একটি বিষয় ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র। প্রায়ই দেখতাম, সন্ধ্যেবেলায় অফিস থেকে ফিরে কারও না কারও ঠিকজি-কোষ্ঠী তৈরি করতে বসেছেন, চার পাশে নানা রকমের পুরনো পাঁজিপুঁথি ছড়ানো, খাতা-কলম বাগিয়ে মন দিয়ে নানা রকম অঙ্ক কষছেন। তো, সেদিন তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, ''তুই তো অঙ্ক কষতে ভালবাসিস, ক'টা যোগবিয়োগ করে দিবি? একটু টায়ার্ড লাগছে।'' পাশে বসে পড়লাম। তিনি গ্রহনক্ষত্রের নানা হিসেবনিকেশ দেখে নানা রকম সংখ্যা বলতে লাগলেন, বছর মাস দিনের নানা পাটিগণিত কষতে বললেন, আমিও মহা আনন্দে আঁক কষে ফলাফল জানিয়ে চললাম এবং বিস্ফারিতনয়নে আবিষ্কার করলাম, সেই অঙ্ক থেকে কত লোকের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে: জাতকের কত বয়স অবধি শনির দশা চলবে, তার পরে বৃহস্পতি ... । অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী, এ-সব তো বটেই, আরও অনেক রকমের নামধাম শিখেছিলাম সেই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়। ওই একদিনই, তার পরে আর সুযোগ হয়নি। লেগে থাকলে একটা ভাল কেরিয়ার হতে পারত। কিন্তু একটু বয়েস বাড়তেই মতিগতি বিগড়ে গেল, মনে আছে ওই জ্যোতিষ নিয়েই তার সঙ্গে বিস্তর তর্ক করেছি, সন্তানসম স্নেহ করতেন, তাই বেশি কিছু বলতেন না, 'পুরোটা জানলে দেখবি মতটা বদলে যাবে' ইত্যাদি সস্নেহ ভর্ৎসনা সহকারে তার্কিক বাঙালিকে থামিয়ে দিতেন, আমিও তাক থেকে আর একটা বাঁধানো দেব সাহিত্য কুটির টেনে নিয়ে ডুবে যেতাম, ওই নেশাটি তো অনেক দিন বজায় ছিল।

না, পুরোটা জানার পরিশ্রম আর করা হয়নি, মতও বদলায়নি। কিন্তু বাল্যস্মৃতি সতত মূল্যবান। তা নিছক ফেলে আসা দিনে ফিরে যাওয়ার সুখ দেয় না, অনেক সময়েই ভাবনার খোরাক জোগায়, চার পাশের পৃথিবীটাকে নতুন আলো ফেলে। অনেকগুলো বছর পরে যেদিন 'কম্পিউটারে ভাগ্যগণনা'র বিজ্ঞাপন দেখি, জ্যোতিষচর্চার ইতিহাসে আমার সেই ক্ষণকালের অবদানের কথা হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল। অস্বীকার করব না, টুক করে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসও পড়েছিল এই কথা ভেবে যে, ভাগ্যগণনায় বালকের পার্টটা আর থাকল না, কম্পিউটার এসে জানিয়ে দিল: ক্লাস ফাইভ, তোমার দিন গিয়াছে। কিন্তু একই সঙ্গে মনের কোণে সেই বালকের জবাবও ভেসে উঠেছিল তৎক্ষণাৎ : তাতে কী প্রামণ হল? যন্ত্রও তো কেবল নির্দেশ মাফিক যোগবিয়োগটুকুই করেছে, ভাগ্যগণনায় এর বেশি কোন কৃতিত্ব আছে তার, শুনি?

এই সওয়াল-জবাব নিয়ে পরেও ভেবেছি। যন্ত্র এসে মানুষের কাজ কেড়ে নিচ্ছে, সেই ভাবনার কথা বলছি না, সে তো অনেক বড় এবং বহুচর্চিত ভাবনা। ভেবেছি কাজটার কথা, যা আগে বালকে করে দিত এবং এখন যন্ত্র করে দেয়। সেই গণনার কাজটি তার নিজগুণেই বালকের মনে জ্যোতিষের প্রতি সম্ভ্রম উৎপাদন করেছিল --- এত যোগবিয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে, তার নিশ্চয়ই একটা মানে আছে, গুরুত্ব আছে। এমন দীর্ঘ গণনার মধ্যে নিশ্চয়ই নিহিত আছে গূঢ় সত্য, তা না হলে এত যোগবিয়োগ হবে কেন? তা, সে-কাজ যখন যন্ত্রসিদ্ধ হয়, তখন ওই সম্ভ্রম আরও জোরদার হবে না? একে তো আধুনিক ঝকঝকে যন্ত্র, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। তার ওপরে এক ঘণ্টার হিসেব সে দু'সেকেন্ডে কষে দিতে পারে। বিশ্বাস কেন বাধ্যতে?

জ্যোতিষের গোটা কারবারটাই বিশ্বাস ভাঙিয়ে চলে, সেই প্রাথমিক সত্য নিয়ে তো কত কাল ধরে কত কথাই বলা হয়ে এসেছে। কারবারের রমরমা তাতে কমেনি, বরং গ্রাম থেকে শহর, গলি থেকে রাজপথ, আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার দাপট বেড়েই চলেছে। কেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা, সমীক্ষা, গবেষণা হয়ে আজ অবধি। কেবল এ দেশে নয়, দুনিয়া জুড়েই। আর্থিক অনিশ্চিতি, সুশিক্ষার অভাব, কুশিক্ষার

প্রচার, গ্রহরত্নের বিপুল ব্যবসা এবং তার বিজ্ঞাপনী অভিযান, এমন অনেক কারণ অবশ্যই এই বাস্তবের পিছনে কার্যকর। তার সঙ্গে জুটেছে রাজনীতির কারবারিদের প্রবল ইন্ধন। আমাদের দেশে রাজনীতিক এবং প্রশাসকের একটা বড় অংশের ব্যক্তিগত জীবনে জ্যোতিষ এবং অন্যান্য অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর অবিদ্যা ও কুসংস্কারের প্রভাব বরাবরই ছিল, কিন্তু অন্তত রাষ্ট্রীয় পরিসর থেকে সেগুলিকে অনেকাংশে তফাতে রাখা হত। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত গত এক দশকে সেই ব্যবধান প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, এখন ভারতীয় সংসদের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ হয় একেবারেই নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠার শৈলীতে, পাঁজিপুঁথি মেনে এবং তার নির্দেশিত আচার পালন করে। এই ভারতে জ্যোতিষ-ব্যবসার সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বগ্রাসী প্রসার ঘটবে, সে আর বিচিত্র কী?

কিন্তু এই বিপুল এবং জটিল বাস্তবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাজ করে চলেছে একটি বনিয়াদি 'বালকোচিত' ধারণা। ধারণাটি এই যে, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান থেকে লম্বা লম্বা অঙ্ক কষে যখন ভাগ্যের গতিবিধি নির্ধারণ করা হচ্ছে, তখন তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা ঠিক কী, কেনই বা তা দিয়ে মানুষের জীবন নির্ধারিত হবে, তার কোনও ব্যাখ্যার দরকার নেই। ত্রৈরাশিক হোক অথবা ভগ্নাংশ, পাটিগণিতের রকমারি আঁক কষে যা পাওয়া গেল তার সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের যোগসূত্রটি কী উপায়ে আবিষ্কৃত হল, সেটাও খোঁজ করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই সব কূটপ্রশ্ন তুললেই বহু মানুষ উত্তর দেবেন: নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। এই ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে সরল হলেও আসলে প্রচণ্ড শক্তিশালী। সারল্যই তার শক্তির উৎস।

সেই সারল্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে বিশ্বাস। যে বিশ্বাস প্রশ্ন তোলে না, প্রশ্ন তুলতে জানে না। কেবল জ্যোতিষ নয়, সব ধরনের কুসংস্কারই এই প্রশ্নহীন বা প্রশ্নবিমুখ বিশ্বাস থেকে তার প্রাণশক্তি জোগাড় করে। এখানেই একটা বিরাট সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের পঠনপাঠনের সামাজিক রীতি। এ দেশে গোটা শিক্ষার আয়োজনে প্রশ্ন করার অভ্যাসকে ছাত্রছাত্রীদের শৈশব থেকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে গোড়া থেকেই তাদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে দমন করার এক দৈনন্দিন অভিযান চলতে থাকে। পড়াশোনা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় পূর্বনির্ধারিত পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক অনুসারে পড়া তৈরি করার অনুশীলন। সেই অনুশীলনে জিজ্ঞাসার কোনও স্বাধীন স্থান নেই, প্রশ্নমালাও বইয়ের মধ্যেই দেওয়া থাকে অথবা শিক্ষক তা স্থির করে দেন।

এই প্রশ্নহীনতার কুফল নানা দিকে নানা ভাবে প্রকট হয়। ক্ষমতাবানের আদেশ মেনে নেওয়ার প্রবণতা তার একটা প্রধান দিক — সেই ক্ষমতা পারিবারিক কর্তা বা কর্ত্রীর হতে পারে, আবার দেশ বা রাজ্যের সরকারি নায়ক-নায়িকারও হতে পারে। গণতন্ত্রের শক্তি ও সম্ভাবনাকে অন্তর এবং অন্দর থেকে বিনাশ করার প্রকল্পে এই প্রশ্নহীন আনুগত্যের মতো কাজের জিনিস যে আর দু'টি হয় না, আমাদের দেশের এবং রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে। ছোটবেলা থেকে প্রশ্নের পথ রুদ্ধ হলে এমন আরও অনেক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। একটি ব্যাধির কথা বিশেষ করে বলতে চাই। দু'টি কারণে। এক, সেটি নিয়ে কথা কম হয়। দুই, তার পরিণাম ভয়ঙ্কর অর্থাৎ, এ হল সেই ধরনের রোগ যাকে 'সায়লেন্ট কিলার' বলা হয়ে থাকে, যা চোখের আড়ালে, চিন্তভাবনার আড়ালে ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

সেই ব্যাধি হল প্রযুক্তিকে বিজ্ঞান বলে মনে করার বিভ্রম। প্রযুক্তি বলতে সচরাচর কেবল যন্ত্রপাতি সম্বলিত যে ব্যবস্থা বা কাঠামো বোঝায়, এখানে শুধু তার কথাই বলছি না, যে কোনও বিদ্যাকে কাজে প্রয়োগ করার যে পদ্ধতি বা প্রকরণ, তাকেই প্রযুক্তি বলে অভিহিত করছি। এই বৃহত্তর অর্থটি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়, এর অনুমোদন আছে শব্দের নিজস্ব পরিসরেই — প্রয়োগ এবং প্রযুক্তি দুই সহোদর শব্দ। ব্যাকরণের ভাষায় সমধাভুজ। যে কোনও বিদ্যার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ তথা প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রয়োগকেই দেখতে পাই, তার ফলই ভোগ করি, সেটা সুফলই হোক অথবা কুফলই হোক। স্টিম ইঞ্জিন থেকে অ্যান্টিবায়োটিক, মহাকাশযান থেকে পারমাণবিক বোমা— বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে পাওয়া প্রযুক্তির এ-সব দৃষ্টান্ত তো বহুচর্চিত, কিন্তু প্রযুক্তির চমৎকারিতার জন্য অনেক আটপৌরে দৃষ্টান্ত — আটপৌরে বলেই—আমরা খেয়াল করি না। এমনকি অনেক সময়েই তাকে প্রযুক্তি বলে চিনতেও পারি না।

জ্যোতিষের চর্চা এমনই একটি দৃষ্টান্ত। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের একটা জন্মগত সংযোগ ছিল, একটা সময় অবধি দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা ছিল অস্পষ্ট। জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহনক্ষত্রের গতিপ্রকৃতির সন্ধান করেছে আর জ্যোতিষ মানবজীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুঁজেছে। কিন্তু ক্রমশ এই দুই ধারা নিজের নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছে এবং তাদের মধ্যে

মৌলিক তফাত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানচর্চার পথ অনুসরণ করেছে, অন্যটা বেছে নিয়েছে কতকগুলো কাল্পনিক ধারণাকে বিজ্ঞানের মোড়কে পরিবেশনের পথ, পরবর্তী কালে যার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ব্যবসার স্বার্থ ও কলাকৌশল। কিন্তু মোড়কটা তুচ্ছ করার নয়, কারণ বহু মানুষের চেতনায় বা অবচেতনে ওই মোড়কের আকর্ষণই প্রবল এবং দুর্মর, যা তাঁদের ভাগ্যগণনায় বিশ্বাসী করে তোলে, করে রাখে। আর সেই প্রক্রিয়াটির পিছনেই মস্ত বড় ভূমিকা পালন করে প্রযুক্তি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নাম করে এবং তার নানা হিসেবনিকেশ কাজে লাগিয়ে মানুষের বিধিলিপি রচনার প্রযুক্তি। বিশ্বাসীরা প্রযুক্তির চাকচিক্যেই মুগ্ধ হন, তার পিছনে কোন বিজ্ঞান কাজ করছে, তাকে আদৌ বিজ্ঞান বলার কোনও যুক্তি আছে কি না, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামান না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম যে, এত অঙ্ক কষে ভাগ্যফল নির্ণয় করা হচ্ছে, কিছু একটা তো নিশ্চয়ই আছে।

ভাগ্যগণনার কারবার এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকা অন্ধবিশ্বাসের ব্যাধির সঙ্গে লড়তে চাইলে একেবারে শৈশব থেকে লড়াইটা জারি রাখতে হবে, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। কোনটা বিদ্যা, কোনটাঅবিদ্যা, কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা বিজ্ঞানের মুখোশধারী অবিজ্ঞান, সেই ধারণাগুলো প্রথম থেকেই পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার, তা না হলে প্রযুক্তির ধাঁধায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আটকানো কঠিন। প্রযুক্তি খুবই ভাল জিনিস, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাইরের ব্যাপার, উপরিস্তরের ব্যাপার। সেই বহিরঙ্গ ছাড়িয়ে ভিতরে যেতে হবে, মোড়ক ছাড়িয়ে খুঁজতে হবে অন্তর্বস্তু। লড়াইটা অত্যন্ত কঠিন। কঠিন বলেই অত্যাবশ্যক।

উ মা

করে দেখো ভালো লাগবে (৩)

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

মাঝে মাঝে আঁকতে বসবে নিজেরাই। আঁকার মাস্টার মশাইয়ের কাছে নয়, আঁকার ইস্কুলে গিয়ে নয়। নিজেরাই।

আঁকতে খুব ভালো লাগবে। আঁকতে খাতায় আঁকতে পারো। এমনি খাতাতেও আঁকা যায়।

রঙ নানারকমের হয়। দোয়াতের কালির রঙ, গুঁড়ো রঙ কিনে নিয়ে জলে গুলে, আলতার রং, নানা ধরনের রঙ পেন্সিল। তুলি বানিয়ে নাও কাঠির মাথায় তুলো জড়িয়ে। তুলি কিনতেও পারো।

খাতা ছাড়া যে কোনো রকমের কাগজ আঁকতে পারো। খবরের কাগজের ওপর, খাতার কাগজে, দোকান থেকে কিনে আনা কম দামি কাগজে, মলাট দেবার ব্রাউন পেপারে। যাতে খুশি, যখন যা পাবে তাতেই আঁকো। এক একটা কাগজের ওপর আঁকায় দেখবে এক এক ধরনের মজা।

আঁকা কারো কাছে শিখতে যাবার দরকার নেই। নিজেই যেমনটি পারো, যেমনটি ইচ্ছে আঁকো। কি আঁকবে? যা খুশি, যেটা আঁকতে ইচ্ছে করে তাই। এঁকে নিজে দেখো, বাড়ির লোকজনকে দেখাও, বন্ধুদের দেখাও।

বন্ধুদেরও আঁকতে বলো। খুব মজা হয় দল বেঁধে আঁকলে। এর আনা রঙে ও আঁকলো। ওর আনা কাগজে এ আঁকলো। দল বাঁধা। এক সাথে হওয়া। এমনটাও হতে পারে। একটা আঁকা তুমি শুরু করলে, আর একজন বন্ধু শেষ করলো। দুজনে মিলে একটা ছবি। এমনভাবে দুটো তিনটে ছবি।

দল বাঁধলে ছবি আঁকার শুরুতে আজ কি নিয়ে ছবি আঁকবে সবাই কথা বলে নিলে। ধরো তোমার, তোমাদের চারপাশে যা দেখেছো তাই নিয়েই। রাস্তা, পুকুর, গাছ, দোকান, বাজার, বাড়ি, খেলার মাঠ, খেলা, মানুষ, গরু, কুকুর কত কী।

এইভাবে দেখতে দেখতে, দল বেঁধে আঁকতে আঁকতে মনে হবে পুকুরটা আরও একটা পরিষ্কার হলে পুকুরের ভিতর মাছ দেখা যাবে, পুকুরে হাঁস চড়বে, পাখি আসবে পুকুর পাড়ের গাছে, পুকুর পাড়ে থাকা গাছের পোকা খেতে, ফল খেতে।

মনে হবে রাস্তায় আরও কয়েকটা গাছ বেশি থাকলে ভালো হতো, যত গাছ থাকবে তত রাস্তায় ছায়া হবে, গরম কম লাগবে। গাছে পাখি থাকবে, পাখির ডাক শোনা যাবে, ডাক শুনে পাখি খোঁজা হবে, পাখি চেনা হবে।

এই দেখো দেখতে দেখতে ছবির বিষয়ে চলে এলো পুকুরের মাছ, হাঁস, পুকুর পাড়ের গাছ, রাস্তায় গাছ, গাছে পাখি, কত কী। আবার সব গাছ একরকম নয়, সব গাছের পাতা একরকম নয়, নানা গাছের ফুল নানা রকম। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছের পাতা, ফুল দেখে আঁকো। বাড়িতে নিয়ে এসে আঁকতে পারো। আঁকার বিষয় বদলে বদলে যাবে। পুকুরের ছবি, গাছের

ছবি, গাছের পাখি আঁকতে আঁকতে দেখবে একদিন তোমরা পুকুর, গাছ, পাখি, ফুল, পাতা, মাঠ, পার্ক। পুকুরে, মাঠে, পার্কে যারা থাকে তাদের ভালবেসে ফেলেছো।

আঁকতে আঁকতে আঁকার বিষয় খুঁজতে খুঁজতে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছো।

তখন কেউ যদি পুকুর বোজায়, গাছ কাটে, মাঠ পার্ক নষ্ট করে তোমাদের মন খারাপ হবে। তোমরা ভাববে পুকুর বোঝানো যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, মাঠ পার্ক নষ্ট করা যাবে না।

ভাবনা, কথারা চলে এলো ছবির সাথে। খুব ভালো। আঁকার সাথে কথা লেখো। গাছ এঁকে তার তলায় লেখো গাছ কাটা যাবে না। পুকুর এঁকে তার উপরে লেখো পুকুর বোজানো যাবে না। মাঠ, পার্ক এঁকে তার পাশে লেখো— মাঠ, পার্ক বন্ধ করা যাবে না।

ছবির সাথে কথা থাকলে তা হয়ে গেলো পোস্টার। তোমরা ছবিও আঁকলে, পোস্টারও আঁকলে।

ছবি যেমন দেখানোর জন্য, পোস্টারও দেখানোর জন্য। পোস্টার পড়ানোর জন্যও। অনেককে দেখানো, পড়ানোর জন্য। এবার একদিন বন্ধুরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ো। একদলের হাতে পোস্টার, একদলের হাতে আঠার ছোটো বালতি। আঠা নানা ভাবো বানানো যায়। খোঁজ খবর করে জেনে নাও কিভাবে আঠা বানানো যায়। সে আর তোমাদেরকে লিখে জানালাম না। জানাতে গেলে এই লেখাটার অনেকটা জায়গা চলে যাবে।

পাড়ার দেওয়ালগুলো একটু ঘষে নাও। ঘষে নেবার সহজ উপায় নারকেলের দড়ি একটু পাকিয়ে নাও, তা দিয়ে ঘষে দেওয়ালটা পরিষ্কার করে নাও। দেওয়াল ঘষার সময় মুখটা রুমাল দিয়ে ঢেকে নিও। এরপর পোস্টারে আঠা লাগিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দাও। তারপর হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে দাও। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে বৃষ্টি বাদলার খবর থাকলে পোস্টার লাগাবে না।

আরও একটা কথা খেয়াল রাখবে। সেই সেই দেওয়াল বাছবে যেখান দিয়ে বেশি লোক আসা যাওয়া করে। অনেকের চোখে পড়াতে হবে তোমাদের বানানো পোস্টার। যাতে তোমদের বানানো পোস্টার, কথা, ছবি, অনেকে দেখে, পড়ে, ভাবে, তোমাদের কথা সাথে একমত হয়।

আর একভাবে পোস্টার দেখাতে পারো। ধরো ভাবলে ছুটির দিনে বিকেলে পোস্টার দেখাবে। একটা লম্বা সুতলি দড়ি নিলে। সুতলি দড়ি পাড়ার হার্ডওয়ারের দোকানে পাওয়া যায়। পোস্টারের উপর দিকে আঠা লাগালে। তারপর দড়ির গায়ে পোস্টারের উপর দিকটা লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিলে। খেয়াল রেখো পোস্টারের উপর দিকের লেখাটা যেন পড়া যায়। তারপর দল বেঁধে গিয়ে দড়ির একটা মাথা কোনো একদিকে কোনো কিছুর সাথে বাঁধলে, আর একটা দিক আর একটা কিছুর সাথে বাঁধলে। পোস্টার-মালা তৈরি হয়ে গেল। একটা বিষয়ে একটা মালা। ধরো একদিন একটা মালা—পুকুর বাঁধানো নিয়ে। একদিন মাঠ বাঁধানো নিয়ে। এইভাবে পোস্টার দেখিয়ে একটা সময়ের পর খুলে নিয়ে চলে এলে। একদিন এক জায়গায় একটা পোস্টার-মালা। অন্যদিন সেই একই জায়গায় আর একটা বিষয় নিয়ে অন্য একটা পোস্টার-মালা। আবার একটা পোস্টার-মালা একদিন এক জায়গায়, অন্যদিন অন্য জায়গায়।

পোস্টার জলে ভিজে নষ্ট হবে না, কেউ ছিঁড়ে ফেলে দেবে না। তোমাদের কাজ, ভাল-লাগা নষ্ট হবে না।

এই তো সামনে দুর্গাপূজো আসছে। তোমাদের পাড়ায় অনেক মানুষ ঠাকুর দেখতে আসবে। তোমরা বাড়ির বড়োদের কাছে গিয়ে আবদার করো। পূজোর প্যান্ডেলের কাছে একটা জায়গা বানিয়ে দিতে তোমাদের বানানো পোস্টার দেখানোর জন্য। বাঁশের খুঁটি পুতে, বাঁশের দরমা লাগিয়ে পোস্টার দেখানোর জায়গা বানিয়ে দিতে। গিয়ে বলে দেখো না কি হয়। হয় 'না' বলবে, নয়তো 'হ্যাঁ' বলবে। যদি 'হ্যাঁ' বলে তাহলে ভালো।

পোস্টার কাগজে লেখা যায়। দেওয়ালেও লেখা যায়। কিছুই না। ধরে নাও দেওয়ালটা হলো বড়ো কাগজ। পোস্টারের ছোটো কাগজের বদলে দেওয়াল বড়ো কাগজ। পোস্টারে ছোটো, সরু তুলির বদলে দেওয়ালে বড়ো, মোটা তুলি। পোস্টারে পাত্‌লা রঙের বদলে দেওয়ালে ঘন রঙ।

পোস্টারে বসে লেখা, দেওয়ালে দাঁড়িয়ে লেখা। পোস্টার একা একা কিংবা দল বেঁধে। দেওয়াল দল বেঁধেই— এই যা ফারাক। দুটোর মধ্যে দেওয়াল লেখায় মজা বেশি, বেশ একটা হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড।

যা বলছিলাম— সামনের পূজোতে পোস্টার দেখানোর কথা, তেমনি হতে পারে দেওয়াল লেখা দেখানো।

একটা কথা ফিরিয়ে আনি। লেখাটা শুরু করেছিলাম ছবি আঁকা দিয়ে। পোস্টারে আর দেওয়াল লেখায় যেমন কথা থাকে, ছবিও থাকে। তোমরা কথার সাথে মিলিয়ে ছবি এঁকো।

ছবির সাথে মিলিয়ে কথা লিখো।

কাজটা করে দেখো খুব ভালো লাগবে। বানিয়ে বলছি না, আমরাও করেছিলাম।

এই সব কাজের সাথে মিলিয়ে আর একটা কাজ করো। বাড়িতে বড়োদের কাছে আবদার করো — যেদিন যেদিন পোস্টার বানাবে, পোস্টার লাগাবে, পোস্টার টাঙাবে, দেওয়াল লিখবে, আঁকবে—সেদিন সেদিন যারা পারবে, সবাই হলে খুব ভালো হয়, বাড়িতে বড়োদের কাছে আবদার করো— যেদিন যেদিন পোস্টার বানাবে, পোস্টার লাগাবে, পোস্টার টাঙাবে, দেওয়াল লিখবে, আঁকবে, সেদিন সেদিন বাড়ি থেকে বানানো খাবার নিয়ে আসবে সবার জন্য। কেনা খাবার নয়, এক একটা বাড়ি থেকে আলাদা আলাদা রকমের খাবার। সবাই সবাইয়ের আনা খাবার। একটু করে হলেও ভাগ করে খেতে পারো। কাজের সাথে বাড়িতে বানানো খাবার কাজকে বোঝা নয়, কঠিন নয়, সহজ, মজার করে তোলে। করে দেখো ভালো লাগবে।

জানিও। আমরা হাজির হয়ে যাবো। তোমাদের সাথে খাবার ভাগ করে নেবো।

জানিও। আমাদেরও ভালো লাগবে।

উমা

হেঁচকি — একটি বিড়ম্বনা

গৌতম মিস্ত্রী

হেঁচকি, নামান্তরে হিক্কা তোলা একটি বিড়ম্বনা ভুক্তভোগীর কাছে। নিজের ও পাশে থাকা পরিচিতের কাছে হেঁচকি এক বেয়াড়া উৎপাত, সশব্দে নিম্নমুখী বায়ুত্যাগের মতো আশঙ্কাহীন এক অসামাজিক বিড়ম্বনা আর অপরিচিতের কাছে বিনে পয়সার বিনোদন। বিনে পয়সার সেই বিনোদনের নাটকের বেরসিক কুশীলব স্ব-ইচ্ছায় মোটেই হেঁচকি তোলেন না। বরং হেঁচকি তুলে তুলে নাজেহাল হওয়া বেরসিক ভুক্তভোগী মানুষ মোটেই হেঁচকিকে গুরুত্বহীন মনে করেন না। অভিনয় বেশ কাঁচা হলে, সেটা বোঝা যায়। অদক্ষ অভিনেতা শিয়ালের মতো হুক্কাহুয়া ডাকতে পারলেও অভিজ্ঞ অভিনেতার হিক্কা তোলার অভিনয়ও সহজেই ধরা যায় — সেই অভিনয় বেশ কাঁচা। হাসি, কান্না, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি মেজাজের মতো আসলি হেঁচকির মেজাজ স্বতন্ত্র। দর্শকের কথা বাদ দিই। আমরা একটু সহানুভূতি নিয়ে হেঁচকিতে নাজেহাল মানুষটির কাছে যাই।

তিনটি প্রশ্ন— (১) হেঁচকি কী? (২) হেঁচকি কেন হয়? (৩) হেঁচকি থেকে পরিত্রাণের কী উপায়?

হেঁচকি কী — হেঁচকির সময়ে আক্রান্ত ব্যক্তির অনুকরণীয় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হেঁচকি ওঠে। শ্বাস নেবার সাবলীল ক্রিয়ার এক নিয়ন্ত্রণে অক্ষম সাময়িক জট পাকানো সমস্যা হল হেঁচকি।

একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বুক ও পেটের মধ্যেকার মাংসপেশি দিয়ে গড়া মধ্যচ্ছদা নামে এক মাংসপেশি পেটের ও বুকের মধ্যেকার পাঁচিল হিসাবে থেকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বুকের মধ্যের শ্বাস টানা ও ছাড়া নামে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পেশি দিয়ে গঠিত এই পাঁচিলের বৈজ্ঞানিক নাম ডায়াফ্রাম। এই পর্দা আংশিক ঐচ্ছিক মাংসপেশি দিয়ে গঠিত। শ্বাস টানার জন্য বুকের পাঁজরের হাড়ের মধ্যেকার সমগোত্রীয় আংশিক ঐচ্ছিক পেশি (ইন্টারকস্টাল মাসলস্) মধ্যচ্ছদার কাজে সঙ্গত দেয়।

পেশি যখন আংশিক ঐচ্ছিক — হাঁটার সময়ে পায়ের মাংসপেশি ব্যবহার আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের উপরে নির্ভর করে। ডাক্তার-কবিরাজ, মায় আমার পরিবার আমাকে হাঁটতে বললেও আমার ইচ্ছে না হলে আমার হাঁটার দায়িত্বে থাকা পায়ের পেশি আমার ইচ্ছে ছাড়া এক বিন্দুও নড়বে না। হাঁটার জন্য পায়ের পেশিকে তাই পূর্ণ মাত্রার ঐচ্ছিক পেশি বলে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য হার্টের বা অন্ত্রের (খাদ্যনালীর) পেশির সঙ্কোচন প্রসারণ মোটেই আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা করে না। আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে হৃদপেশি ও খাদ্যনালীর পেশি কাজ করে যায়, আমরা না চাইলেও। এগুলো অনৈচ্ছিক পেশি। শ্বাস টানা ও ছাড়ার জন্য বুকের পাঁজরার পেশি আর মধ্যচ্ছদার পেশি কাজ করে প্রধানত আমাদের অগোচরেই। আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় থাকে না। তবে আমরা চাইলে কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস নেওয়া বা ছাড়া বন্ধ রাখতে পারি, যতক্ষণ আমাদের চেতনা ও পেশির কাজের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। শ্বসনের পেশিগুলো তাই আংশিক ঐচ্ছিক পেশি। সাঁতার জানা মানুষের শ্বাসরোধে আত্মহত্যার জন্য তাই দড়ি আর কলসি লাগে।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শ্বাস টানতে আর নিঃশ্বাস ছাড়তেই হয়। এর জন্য আমাদের অগোচরেই শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী, এমনকি ঘুমের মধ্যেও আমাদের সচেতন ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে আমরা শ্বাস টানি ও ছাড়ি। শ্বাস টানার জন্য মানব শরীরে হাঁপর সদৃশ দুটো বেলো আছে— (১) বুকের খাঁচার পেশি (ইন্টারকস্টাল মাসলস্) আর (২) মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম)। ভাগাভাগি করে এই দুই উপায় জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কাজে ফাঁকি না দিয়ে কাজ করে আমাদের জীবিত রাখে। হেঁচকি হল এই কাজের বেয়াড়া— মানুষটিকে বেকায়দায় ফেলা একটি অবাঞ্ছিত অতি সক্রিয়তা।

হেঁচকির কারণ শ্বাস টানার দায়িত্বে থাকা বিশেষ করে মধ্যচ্ছদার হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় ও অনিয়ন্ত্রণক্ষম সঙ্কোচন। ঘটনাচক্রে এটা হয় ফুসফুসে হাওয়া টানার সময়— অর্থাৎ মধ্যচ্ছদা আর বুকের খাঁচার পেশির অসময়ের চকিত সংকোচনে। এই সময় হাওয়া নালীর মুখের ভাল্ব, স্বরযন্ত্রমুখ (গ্লটিস, ল্যারিংক্স-এর ভোকাল কর্ড) প্রয়োজন নেই বলে শ্বাস টানার জন্য খোলা না থেকে মানব শরীরের সফটওয়ারের প্রোগ্রাম অনুযায়ী (মস্তিষ্ক নির্দেশে) সঠিকভাবেই বন্ধ হয়ে থাকে। সোজা কথায়, শ্বাস টানার বেলো, বুকের হাঁপর শ্বাস টানছে, হঠাৎ অপ্রয়োজনে। ব্যক্তির প্রয়োজন নেই, নেই সচেতন ইচ্ছে। ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে নয় সেই শ্বাস টানা। বুকের হাঁপর শ্বাস টানার চেষ্টা করলেও শ্বাসনালীর স্বরযন্ত্রমুখ তখন বন্ধ থাকে। শ্বাস টানার অসফল ও তীব্র ও পৌনঃপুনিক (রেকারিং) প্রচেষ্টায় বন্ধ থাকা হাওয়া নালীর মুখের ভাল্বের (ল্যারিংক্স) মধ্য দিয়ে জোর করে বাতাসের হাওয়া যাবার সময়ে একটা শব্দ হয়—'হিক' শব্দের মতো। তাই বাংলায় এর সহজ নাম হিক-কা (হিক্কা), কাব্যিক নাম হেঁচকি। ইংরেজিতে হিক্কাপ (hikkap), কথ্য ইংরেজিতে (hik-kaf, hikcough)।

হেঁচকি কেন হয় — হেঁচকি তোলার শারীরবৃত্তীয় ঘটনার পরম্পরায় জানা গেল। কিন্তু কেন হয় এমন বদখেয়ালি মধ্যচ্ছদার বেখেয়ালি অনিয়ন্ত্রিত সক্রিয়তা? আমাদের শ্বাস নেওয়ার জন্য বুকের খাঁচা ফোলাতে হয়, বুকের খাঁচার আয়তন বাড়াতে হয়। অনেকটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জে তরল ওষুধ ভরার মতো। ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মধ্যের পিস্টন টানলে সিরিঞ্জের মধ্যের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে কমে যায়, বায়ুমণ্ডলের নিরিখে সিরিঞ্জে ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়। ইনজেকশনের শিশি থেকে তরল ওষুধ সিরিঞ্জে প্রবেশ করে। ঠিক তেমনই বুকের খাঁচার আয়তন বেড়ে যাওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের হাওয়া নাক আর মুখ দিয়ে বুকের মধ্যের বায়ুমণ্ডলের নিরিখে ঋণাত্মক চাপওয়ালা ফুসফুসে প্রবেশ করে। বুকের খাঁচা ফোলানোর জন্য দুটো কর্মকাণ্ড সক্রিয় হয়।

প্রথমত বুক ও পেটের মধ্যেকার পেশি দিয়ে তৈরি দেওয়াল, মধ্যচ্ছদা, নিষ্ক্রিয় (শিথিল) অবস্থায় বুকের দিকে খোলা প্যারাসুটের মতো উঠে থাকে। মস্তিষ্কের ফ্রেনিক ও ভেগাস স্নায়ুর বয়ে আসা সঙ্কেতে মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয় আর টান টান হয়ে গিয়ে লম্বালম্বিভাবে বুকের আয়তন বাড়িয়ে দেয়। পেটের মধ্যে চাপ বেড়ে যায়, ভুঁড়িটা সামনের দিকে একটু ফুলে যায়। দ্বিতীয়ত বুকের দু'দিকের ১২ জোড়া পাঁজরের মধ্যেকার পেশির সংকোচনে পাঁজরের বেড় দেওয়া, বালতির হাতলের মতো সরু হাড়গুলো একসঙ্গে একই তালে বাইরের দিকে প্রসারিত হয়। ফলে আড়াআড়িভাবেও বুকের আয়তন বেড়ে যায়। তখন আমরা শ্বাস টানি। এই দুই ধরনের পেশির সংকোচনের জন্য যেমন বুকের খাঁচার আয়তন বেড়ে যায়, তার ক্ষণিক পরে সেই পেশির প্রসারণ হবার সময় বুকের আয়তন কমে যায়। তখন আমরা শ্বাস ছাড়ি।

জাগ্রত অবস্থায়ই হেঁচকি হয়। এই সময়ে অনুপযুক্ত সময়ে

ফ্রেনিক (বিশেষ করে বাম দিকেরটা) ও ভেগাস স্নায়ুর অপ্রাকৃত কর্মকাণ্ডের কারণে মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হয় অথবা বুকের খাঁচার পাঁজরের পেশির সংকোচনে শ্বাস টানার বেখেয়ালি অপ্রয়োজনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তখন মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত শ্বসন ক্রিয়ার হিসাবে শ্বাস নেবার প্রয়োজন নেই বলে হাওয়া নালীর মুখের ভাল্ব, স্বরযন্ত্রমুখ বন্ধ থাকে। কিন্তু বুকের মধ্যে নিম্নচাপ সৃষ্ট হয়ে গেলে বন্ধ কিন্তু দুর্বল সেই আগলের সরু ফাঁক 'হিক' শব্দ করে হাওয়া ঢুকে পড়ে ফুসফুসে। সশব্দে হাওয়া ঢুকে গেলেই স্বরযন্ত্রমুখ তড়িৎ গতিতে বন্ধ হয়ে যায়। স্বরযন্ত্রমুখ বন্ধ হবার শব্দের কম্পন আলাদা। সন্ধ্যারাতের কাল প্যাঁচার ডাকের মতো অস্বস্তির হিক শব্দের হেঁচকি হতেই থাকে ক্ষণে ক্ষণে। একটা হেঁচকির পরে পরেরটার জন্য বিড়ম্বনার সেই প্রতীক্ষা। প্রতিমিনিটে ৪ থেকে ৬০ বার পর্যন্ত হতে পারে হেঁচকির হার, তবে একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ হারেই ঘটতে থাকে হেঁচকির দৌরাত্ম্য। হেঁচকির তাল-লয় জ্ঞান আছে।

মস্তিষ্কের নিয়ম ভঙ্গ করে মধ্যচ্ছদা ও বুকের খাঁচার পাঁজরের পেশির (ইন্টারকস্টাল মাসলস্) সংকোচনের জন্য জানা কারণগুলি---মধ্যচ্ছদার সঙ্গে লেপ্টে থাকা গলনালী (ইসোফেগাস) বা পাকস্থলীর সাময়িক প্রদাহ, ক্ষত, পাকস্থলীতে উত্তেজক খাদ্যের উপস্থিতি, পাকস্থলীর টিউমার; ফ্রেনিক স্নায়ুর গায়ে লেপ্টে থাকা ফুসফুসের বা লসিকা গ্রন্থির রোগ, রক্তের সোডিয়াম আয়নের অস্বাভাবিক মাত্রা, মস্তিষ্কের রোগ, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস, এমনকি মানসিক রোগসমূহকে দায়ী করা হয়ে থাকে। অনভ্যাসে সিগারেট, মাত্রাতিরিক্ত মদ, লঙ্কা অথবা জর্দা পান খেলেও হেঁচকি হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই হেঁচকির কোনো কারণ জানা সম্ভব হয় না।

হেঁচকি হলে কী করে তার থেকে মুক্তি পাব— এইখানে দুটি কথা আছে। হেঁচকি ৪৮ ঘণ্টার বেশি না কম? যদি বেশি হয় তবে এই নিবন্ধ এখন আর পড়বেন না। ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। যাঁদের হেঁচকির ব্যাপ্তি ৪৮ ঘণ্টার কম তাঁরা হেঁচকির মুখোশে এমন কোনো ভয়ানক রোগে ভোগেন না, যার জন্য ডাক্তার দেখানো বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা জরুরি। আলোচনার শেষ পর্বে এই নির্বিষ গোত্রের হেঁচকি থেকে মুক্তি পাবার আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

মামুলি হেঁচকি (স্থায়িত্বকাল ৪৮ ঘণ্টার কম) থামানোর উপায় ঃ (১) কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থাকা। এইটা সবচেয়ে সফল উপায়। হৃদরোগে বা হাঁপানি রোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য এটা ক্ষতিকর, তাঁরা এটা চেষ্টা করবেন না। যেহেতু অনেক সময়ে ঐচ্ছিক এই প্রচেষ্টা হার মেনে যায় মস্তিষ্কের অনৈচ্ছিক শ্বাস নেবার প্রক্রিয়ার কাছে, তাই অনেক সময়ে এটা সফল হয় না। সেক্ষেত্রে একটা ছিদ্রহীন মাথার মাপের দ্বিগুণ আয়তনের একটা পলিথিনের ব্যাগের খোলা অংশ দিয়ে দুই হাত দিয়ে আঁটোসাঁটো করে নাক ও মুখের ছিদ্র বেড় দিয়ে ধরে ব্যাগের মধ্যের হাওয়া শ্বাসের সাথে টানতে হবে ও নিঃশ্বাস ঐ ব্যাগের মধ্যে ছাড়তে হবে। পলিথিনের ব্যাগটা নাক আর মুখের ছিদ্রের উপর থেকে সরানো চলবে না। এই রকম করতে করতে তিন চার মিনিট পর ব্যাগের মধ্যে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে নির্গত কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়তে থাকবে ও সেই কারণে শ্বাসের গতি ক্রমশ তীব্র হতে থাকবে, মোটামুটি নিশ্চিতভাবে হেঁচকিও থেমে যাবে। ফুসফুসে ও রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকবে ও কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়তে থাকবে। মস্তিষ্কে কার্বনডাই অক্সাইডের সমৃদ্ধ রক্তের ঘুম পাড়ানি প্রভাবে মস্তিষ্কের, ফ্রেনিক ও ভেগাস স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমিত হয় বলে হেঁচকি কমে এমনটা মনে করা হয়। পলিথিন ব্যাগের মধ্যে এক সময় কার্বডাই অক্সাইডের মাত্রা এতটাই বেড়ে যাবে তখন বাধ্য হয়েই ব্যাগটা মুখ থেকে খুলে নিতে হবে। তারপর মিনিট পাঁচেক কথা বন্ধ করে থাকতে হবে। কাশি পেলেও সেটা চাপতে হবে। প্রয়োজন হলে এই প্রক্রিয়াটা বারবার করা যায়।

- ঠাণ্ডা জল পান করা। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জলে গার্গল করা।
- কোঁত পাড়া (valsalva manoeuvre) — পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের জন্য
- পাতিলেবু কামড়ে ধরা।
- এক চামচ চিনি খাওয়া।
- হাত দিয়ে জিভ টেনে ধরে রাখা।
- হাত দিয়ে আলতো করে বন্ধ করা দুই চোখের উপরে চাপ দেওয়া।
- বসে থাকা অবস্থায় ১ মিনিটের জন্য হাঁটু মুড়ে বুকের উপরে হাঁটু চেপে ধরা।
- একটা খুব সরু পাইপ (স্ট্র) দিয়ে জোরে জল পান করা (forced inspiratory suction)।
- চিকিৎসকের অনুমতি নিয়ে বিধান মতো কিছু ওষুধ ব্যবহার করা।

উমা

জঞ্জাল সমাচার

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জঞ্জাল আধুনিক যুগে একটা বড় সমস্যা। যত জনসংখ্যা বাড়ছে, ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জঞ্জাল। আদিম যুগে মানুষ যখন যাযাবর ছিল তখন তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেলে তারা তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে রেখে চলে যেত। তার অনেক পরে গ্রিসে নিয়ম করা হল অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। মৃত পোষ্যদের ফেলে যেত এখানে ওখানে— পরে যা শেয়াল শকুনের খাদ্য হত। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমে জঞ্জাল বাড়তে লাগল। পরিবেশও দূষিত হতে লাগল। এর একটা বিহিত করার কথা পরিবেশবিজ্ঞানীরা তখন থেকে চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু জঞ্জালের যে অনেক রূপ।

আজকাল শহরাঞ্চলে দেখি সকালে বাঁশি বাজিয়ে ট্রলি করে গার্হস্থ্য জঞ্জাল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির আনাজের খোসা, মাছের আঁশ, ডিমের খোলা, এঁটো-কাটা প্লাস্টিক ব্যাগে করে সাফাইকর্মীর ট্রলিতে ফেলে দেওয়া হয়—সাফাই কর্মীরা তা জমা করে রাখে, পরে তা লরি করে চলে যায় ভাগাড়ের মতো জায়গায়। তার আগে আজকাল কম্প্যাক্টর মেশিনে কম্প্যাক্ট করে (মণ্ড তৈরি করে) নেওয়া হয়। আবর্জনা জমতে জমতে ধাপায় আবর্জনার পাহাড় তৈরি হয়। প্রতিদিন শত শত টন আবর্জনা জমছে ধাপায়, জায়গা সঙ্কুলান হচ্ছে না —তাই পাহাড়ের চূড়া দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। ওই আবর্জনার পাহাড়ে মাঝে মাঝে মিথেন গ্যাস নির্গত হয়ে আগুনও লেগে যাচ্ছে। বেলঘরিয়া স্টেশন পরোলেই ট্রেন থেকে চোখে পড়ে ওইরকম আবর্জনার পাহাড়। মাঝে মাঝে দরিদ্রদের ওই পাহাড়ে খোঁজাখুঁজির জন্য ধস নেমে মৃত্যুও ঘটে।

বিদেশে এই 'রাবিশ'-এর পরিমাণ আমাদের থেকে ঢের বেশি। সবচেয়ে বেশি গার্হস্থ্য রাবিশের পরিমাণ আয়ারল্যান্ডে—বছরে জনপ্রতি ৭৬০ কেজি; আমেরিকার ৭৪০, ইংল্যান্ডে ৬১০। জঞ্জালের জগৎটি কিন্তু বিশাল। মোট রাবিশের মাত্র ৭ শতাংশ গার্হস্থ্য আবর্জনা। সিংহভাগ আবর্জনা তৈরি হয় নির্মাণ কাজে। বাড়িঘর ভাঙাগড়া যার আসল অংশ, কৃষিকাজে, খনির কাজে এবং শিল্পের বর্জ্য পদার্থে। তাছাড়া নদীনালা ড্রেজিং ও নিকাশি সংস্কারেও বিস্তর আবর্জনার সৃষ্টি হয়। তার ওপরে বিজ্ঞান প্রযুক্তির যত উন্নতি হচ্ছে, মানুষের হাতে ভোগ্যপণ্য বাড়ছে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রের বর্জ্য। প্রতিদিন কাঁড়ি কাঁড়ি অকেজো হয়ে যাওয়া টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল প্রভৃতির আবর্জনা তৈরি হচ্ছে। এই আবর্জনা সমাজে ক্ষতি করছে মারাত্মকভাবে। কারণ ওতে পারদ ও সীসার যৌগও থাকে।

হিমালয়ও জঞ্জাল সমস্যার শিকার। মাউন্ট এভারেস্টে চড়ার হিড়িক অনেক বেড়েছে। অভিযাত্রীরা এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে হিমালয়ে ফেলে আসছে নানা আবর্জনা। যেমন প্লাস্টিক ব্যাগ, তাঁবু, দড়ি, ব্যাটারি, অক্সিজেন, বোতল ইত্যাদি। এতে হিমালয় জঞ্জালপূর্ণ হচ্ছে। নেপালি শেরপা লাগিয়ে টন টন আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়। তাই নেপাল সরকার আজকাল হিমালয় অভিযানে অভিযাত্রীদের কাছ থেকে চড়া মাশুল আদায় করছে। শুধু কি তাই— মহাশূন্যও জঞ্জাল থেকে মুক্ত নয়। কত যে পরিত্যক্ত ছোট ছোট উপগ্রহ বা তাদের অংশ পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হিসেব নেই। এসবই মানুষের সৃষ্টি।

মাটিতে পুঁতে দিলে জঞ্জালমুক্ত করা যায় বটে, কারণ এতে ধীরে ধীরে আবর্জনা মাটিতে মিশে যায়। কিছুটা উর্বরা শক্তিও বাড়ায়। তরকারির খোসা, খড়, কাগজ, কাপড়, কাঠ—এসব ডিকম্পোজড হতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু প্লাস্টিক হল এমন একটি বস্তু যা মাটিতে মিশে যায় না—শত শত বছর অবিকৃত থাকে। আধুনিক যুগে এই প্লাস্টিক নিয়েই হয়েছে মূল সমস্যা। আবর্জনার আরেকটি উপকরণ হল থার্মোকল, আধুনিক বিজ্ঞানের দান।

জঞ্জালমুক্ত করতে কি করা হয়? মূলত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। সেখানে ধীরে ধীরে আবর্জনা ডিকম্পোজড হয়ে, পচে মাটিতে মিশে যায়। দ্বিতীয়ত রাবিশকে পুড়িয়েও ফেলা হয় ক্ষেত্রবিশেষে। তবে এক্ষেত্রে যে গ্যাস নির্গমন করবে তা লক্ষ্য রাখতে হবে —যাতে উষ্ণায়ন না ঘটে। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ উপায় হল—রিসাইক্লিং। উন্নত ধরনের প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করে অনেক কাজের জিনিস তৈরি করা যায়। আবর্জনা থেকে মুক্তি ঘটে।

জঞ্জালমুক্ত করতে আমরা কি করতে পারি? প্রথমত চাই সচেতনতা। প্লাস্টিক ব্যাগ নয়, চটের ব্যাগ নিয়ে বাজার করা দরকার। প্যাক করা খাদ্য, ফল না কিনে লুজ জিনিস কেনা উচিত। প্লাস্টিককে যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। নাইলন বা সিনথেটিক পোশাকের পরিবর্তে কটনের পোশাক ব্যবহার জরুরি। পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র কিনতে হবে। সর্বোপরি ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমাতে হবে। নিজে সচেতন হয়ে জঞ্জালমুক্ত থাকতে হবে তাহলে পরিবেশও সুস্থ সুন্দর থাকবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভালভাবে বাঁচতে পারবে। উমা

মূল্যবোধের সঙ্কট ও বিকল্প

সমর বাগচী

ছোটবেলায় আমি সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে বড় হয়েছি। পড়তাম জিলা স্কুলে। ঐ স্কুলে ছিল দুটো ফুটবল মাঠ, দুটো টেনিস কোর্ট এবং সবরকম খেলাধুলার বন্দোবস্ত। শহর থেকে ছবির মতো হিজলা পাহাড় দেখা যেত। তখনও বিদ্যুৎ আসেনি দুমকা শহরে। আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন শহরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় পেট্রোম্যাক্স জ্বলত আর গমগম করত শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আগমনে। আমাদের বাড়ির পেছনে ছিল পপুলার ক্লাব। সেখানে খেলাধুলা, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুজোপার্বন ইত্যাদি সারা বছর লেগেই থাকত।

প্রায় ৩৫ বছর পর গেলাম আবার দুমকা শহরে প্রচুর নস্টালজিয়া নিয়ে। গিয়ে দেখলাম স্কুলের সব মাঠ ভরে গিয়েছে বাড়িতে। এক চিলতে যে মাঠ পড়ে আছে তা চোরকাঁটায় ভর্তি। পাশের ডাক্তারের বাড়ি জরাজীর্ণ, দুঃস্থ, ভাঙাচোরা। পপুলার ক্লাব ভেঙে হয়েছে সিনেমা হল।

দুমকা যেন সারা পৃথিবীরই এক প্রতিচ্ছবি। এই ভাঙাচোরা পৃথিবীকে দেখেই বহুদিন আগে W.B.Yeats লিখেছিলেন, 'Thing fall apart, centre cannot hold mere anarchy is loosed upon the world. The ceremony of innocense is drowned, the best lack all convictions. And the worsts are full of passionate intensify.' জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার' শুধু সমাজ ও প্রকৃতিকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে না, এ এক আত্মীক সঙ্কটের চিত্রও। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিগুলির ধসে যাওয়ার কথাও। সময়ের যেন গ্রন্থি খুলে গেছে। আমাদের কথায় ও কাজে বৈপরীত্যের ছায়া প্রলম্বিত হয়। আজ এক সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজকে, মানবজীবনকে গ্রাস করছে। প্রেম, প্রীতি, দয়া, নীতি, সহৃদয়তা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, অপরের দুঃখে হৃদয়ে কাতরতা বোধ করা, সততা ইত্যাদি সমস্ত মূল্যবোধ আজ দ্রুত অপসৃয়মাণ। এক উদগ্র লোভ, লালসা এবং হিংস্রতা আজ সমাজ মানসকে দখল করতে বসেছে। তাই চোখের সামনে দুর্বৃত্তের দল একজনকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারলেও আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি না। যদি কেউ কখনো করে তখন তা খবরের কাগজের খবর হয়। এই নীতিহীনতা আজ গ্রাস করেছে তথাকথিত অগ্রগামী রাজনৈতিক দলগুলোকেও, যারা সমাজ বিপ্লবের কথা বলে। যারা নিজেদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না তারা কী করে, বৃহত্তর জীবনের পরিবর্তন আনবে? যে 'আগুনখেকো' বিপ্লবী মন্ত্রী চার ইঞ্চি পুরু লাল কার্পেটে মোড়া শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে স্তূপীকৃত লাল ফিতের ফাইলে বাঁধা থাকেন তিনি কখনই টালিগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের নীচে ৭ ফুট x ৮ ফুট জায়গায় ছেলেপুলে নিয়ে বাস করা, বা রেল লাইনের ধারে ঝুপড়িতে বাস করা, কিংবা তথাকথিত উন্নয়নের কারণে পাহাড়, জঙ্গলে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ আদিবাসীর ছন্নছাড়া জীবনের সাথী হতে পারেন না। লিউ সাউ চি'য়ের 'How to be a good communist'-এর আদর্শ আজ শুধু আপ্তবাক্য এবং দেওয়াল লিখনের জন্য। নিজের জীবনে, আচরণে পালন করার জন্য নয়।

একটা সমাজকে কতকগুলো মূল্যবোধ ধরে রাখে। কখনও তা ধর্মীয় নীতিবোধ, কখনও আদর্শ। এ কাজ বহুযুগ ধরে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ' মহাকাব্যের মধ্যে এই সব মূল নীতিবোধের বৃহত্তর সমাজের ভেতর বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস দেখেছেন। এ যেন প্রতিটি ভারতবাসীর ঘরের কথা। তাই আজও ভারতের এক বৃহৎ অংশের মানুষ রামায়ণ গান গায়, আনন্দে হাসে কাঁদে। আজও হিমালয়ের প্রত্যন্ত গ্রামে গেলে দেখা যায় কী আত্মীয়তার সম্বন্ধ গ্রামের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এখনও বিরাজ করছে। প্রতিবেশীকে সাহায্য করা তাদের জীবনের অঙ্গ, ধর্ম, স্বাভাবিক। এই অতি স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ক এখনও গ্রামে বহু জায়গায় বর্তমান। শহর থেকে কিন্তু সম্পর্ক হারিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আবর্তে গ্রামেও মানবিক সম্পর্ক দ্রুত অপসৃয়মাণ। কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের প্রাক্তন প্রধান সুপ্রিয় ঠাকুরের সাথে যখন আলাপ করছিলাম তখন এক সাঁওতাল সমাজকর্মী সুপ্রিয়বাবুর কাছে এলেন এবং বললেন যে সাঁওতালরা তাদের নাচ-গান ভুলে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামেও রাজনীতি প্রতিটি ঘরকে বিভক্ত করে নিচ্ছে রাজনীতির নিরিখে। সেখানে ভাইয়ে-ভাইয়ে, কাকা-ভাইপোতে, কখনও কখনও পিতা-পুত্রে রাজনৈতিক মতবিরোধ থেকে মনান্তর। এই অবস্থায় সাঁওতালি নাচ-গানকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কি? আদিবাসী নাচ ও গান এক সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।

সামাজিক জীবন যদি ভেঙে যায় তবে ঐ সমবেত নাচ-গানকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কী করে!

আজ পৃথিবী জুড়েই এক মূল্যবোধের সঙ্কট। ইউরোপীয় মানসে খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস ধীরে ধীরে অপসৃয়মাণ। বহু চার্চ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সাম্যবাদ যে এক নূতন আদর্শ মানবসভ্যতার কাছে তুলে এনেছিল তাও পঞ্চাশের দশক থেকে গভীর সংশয়ের আবর্তে। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভোগবাদ এবং বাজারি অর্থনীতির আক্রমণ পশ্চিমী মানুষকে এক উদ্দেশ্যহীন মানসিকতার শিকার করেছে।শিল্প বিপ্লবের পর ভোগবাদী যে শিল্পসমাজ গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেই নিহিত ছিল মূল্যবোধের ধ্বংসের বীজ। **এই সমাজ তিন রকমের বিচ্ছিন্নতা (alienation) সৃষ্টি করছে : এক, প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা। দুই, অপরের সাথে বা সমাজের সাথে বিচ্ছিন্নতা এবং তিন নিজের সাথে নিজের বিচ্ছিন্নতা।**

এর থেকে মুক্তি হবে কী করে? এর কোনো বিকল্প আছে কি? এটা ঠিকই যে এই সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যেও বেশ কিছু মানুষ আছেন যাঁরা মূল্যবোধকে অক্ষয় রেখে জীবনধারণ করছেন এবং মানুষের জন্য কাজ করছেন। একজন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে এই মূল্যবোধের সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠে সুস্থ জীবনাচরণ সম্ভব। কিন্তু একটা সমগ্র জনসমাজের মধ্যে সুস্থ জীবনবোধ, মূল্যবোধের সঞ্চার করব কী করে? এটা তখনই সম্ভব হবে যখন এই বিচ্ছিন্নতা-সৃষ্টিকারী, ভোগবাদী, প্রকৃতি-বিধ্বংসী, অসম শিল্প সমাজের বিকল্পের এক সরল, সাম্যমূলক, প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যমূলক, বিকেন্দ্রিভূত সমাজ তৈরি করা যায় যার ভিত্তি হবে সহযোগিতা — প্রতিযোগিতা নয়, শোষণ নয়। এই সমাজ তো এমনিতে আসবে না। এর জন্য প্রয়োজন নিরন্তর সংঘর্ষ ও নির্মাণ সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরেও আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। উৎস মানুষ পরিচালকদের ধন্যবাদ যে তাঁরা বহুদিন ধরে তাঁদের পত্রিকায় এই শাশ্বত মূল্যবোধের কথা প্রতি সংখ্যায় তুলে ধরছেন।

উৎস মানুষ, জানুয়ারি ১৯৯৯

উমা

পৃথ্বীশ ব্যানার্জী (১৯৫৭-২০২৩)

৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা তিনটেয় রহড়ার বাড়িতে উৎস মানুষের বন্ধু পৃথ্বীশ প্রয়াত হন। ২০২০-তে ফুসফুসের অসুখ ধরা পড়ে। কোভিড পরবর্তী সময়ে তা সামাল দিতে দিনরাত অক্সিজেন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। ঘরবন্দি হয়েও রহড়ার খারিজ নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য পৃথ্বীশ তাঁর দলের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষদিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

উৎস মানুষের অনুরোধ কখনো ফেরান নি। অত্যন্ত দক্ষ অনুবাদক পৃথ্বীশ পত্রিকার জন্য বইয়ের পর্যালোচনাও করে দিয়েছেন। সেই ২০০৮-এ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর উৎস মানুষের বিশেষ সংখ্যাটি বের করতে পৃথ্বীশের সাহায্য পাওয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ওঁর মতো গুণী অথচ প্রচারবিমুখ মানুষ কম। পৃথ্বীশ-এর চোখ দুটি দান করা হয়েছে। রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজির সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজটি সম্পন্ন হয়। এই দানে দুজন দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ফিরে পাবেন।

আমরা উৎস মানুষের বন্ধু প্রয়াত পৃথ্বীশ ব্যানার্জীকে শ্রদ্ধা জানাই।

সামাজিক বঞ্চনার ইতিহাস নিয়ে বইমেলায় উৎস মানুষের নতুন প্রকাশনা — বিশিষ্ট সমাজকর্মী বোলান গঙ্গোপাধ্যায়-এর '*জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে*' । বইটি খানিকটা ভ্রমণ কাহিনীর ঢঙে লেখা। যেখানে মানুষের কথাই মুখ্য।

আমার দাদা — অমর সমর বাগচী (১৯৩৩-২০২৩)

সঞ্জয় অধিকারী

সমরদা সম্পর্কে আসল সত্যটি হল — এই মানুষটিকে বোঝা অতো সহজ নয়। আবার এটাও মিথ্যে নয়, এ মানুষকে বোঝার মধ্যে জটিলতা তো কিছু নেই। আমার মনে হয় ইনি বা এনারা হচ্ছেন সেইসব মানুষ বা মহৎজন যাঁদের উদ্দেশ্য করেই এক সময় বলা হয়েছে বা আজও বলা হয় — 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"। বুঝতে পারছি একটু ধাঁধাঁর মতো হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে; অত্যন্ত সহজ সরল করে বলার চেষ্টা করি। ঠিক যেমন আপনারা উৎস *মানুষে* বিভিন্ন লেখা পড়ে থাকেন আর কি।

তাহলে শুনুন, সমরদা হলেন সেই মানুষ যিনি কলকাতা থেকে পুরুলিয়া এলে শুধু পুরুলিয়ার সায়েন্স সেন্টারের মানুষজনের সাথে ঘরের মানুষের মতো থাকতেন তা নয়, নিজের সাথে চা নিয়ে আসতেন। নিজের হাতে চা তৈরি করতেন। শুধু অফিসে যাঁরা থাকতেন তাঁদের নয়, বাগানে বা গেটে যাঁরা থাকতেন সমস্ত মানুষজনদের ডেকে একসাথে বসে চা খেতেন। শেখাতেন চা তৈরি করা। পদমর্যাদা বলে তাঁর কাছে কোনো জিনিস ছিল না। তিনি যেমন থাকতেন মাটির কাছাকাছি ঠিক তেমনি অন্যদেরও বোঝাতেন মানুষের পরিচয় তাঁর কাজে। কোন পদে আছেন, সেটাতে নয়।

পুরুলিয়া ছিল তাঁর প্রিয় শহর। প্রাণের শহর। ১৯৮২ সালে এই শহরে বিজ্ঞান কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় তাঁরই হাত ধরে। ভারতের মধ্যে প্রথম 'জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্র' পুরুলিয়া শহরের বিজ্ঞান কেন্দ্রটি। অবশ্য পরে সারা ভারতে আরো তিনটি জেলায় বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

১৯৮৭ সালে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম, কলকাতার অধিকর্তা হিসেবে এসে পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে জনপ্রিয় গ্যালারিটির উদ্বোধনের সময়ও তিনিই ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর সাথে এসেছিলেন ড. সরোজ ঘোষ, ডাইরেক্টর জেনারেল, এন সি এস এম এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়।

পুরুলিয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রের যাতে আরো শ্রীবৃদ্ধি হয়, এটাকে একটু আয়তনে বাড়ানো যায়, তার জন্য পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপিতার দরবারেও তিনি নির্দ্বিধায় পৌঁছে যান।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর বক্তৃতায় তিনি পুরুলিয়ার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের বলতেন, ভারতবর্ষে ৬০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে, শতকরা ৬৫ ভাগ লোক নিরক্ষর, বাসস্থান নেই। এইরকম একটা গরিব দেশে এত এত টাকা খরচ করে বিজ্ঞানের রাজপ্রাসাদ তৈরি করার মানে কি? উত্তরটাও তিনিই দিতেন — বলতেন এই দারিদ্র বা নিরক্ষরতার থেকে মুক্তির উপায়ই হচ্ছে বিজ্ঞানের হাত ধরা। তিনি বলতেন— আমরা অর্থাৎ উপরতলার কয়েকটি মানুষই ভারতবর্ষে সুবিধা ভোগ করে থাকি। প্রকৃত গণতন্ত্র এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়। আর যদি সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের চিন্তা ভাবনা গড়ে তুলতেই হবে। সাথে সাথে এটাও জানাতেন —ইউরোপে এই চেতনা আনতে তিন/চারশো বছর লাগলেও, আমাদের অত সময় লাগবে না।

সমরদার সাথে মাঝিহিড়াতে গেছি। স্কুলের ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা মডেল করেছে। একটার পর একটা সমরদা দেখছেন আর তারা কতটা জেনে বা বুঝে করেছে আর কতটা এখনো জানতে পারে নি পরখ করে নিচ্ছেন। বাচ্চাদের সাথে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে অনর্গল বলে চলেছেন বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব তাদের ভাষায়। খাবার সময় হয়ে গেছে তখনও তিনি মগ্ন নিজের কাজে, বিজ্ঞান বোঝানোর কাজে। তার আগেই বক্তৃতা দিয়েছেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'নিত্যদিন জীবনে বিজ্ঞান'। ক্লান্তি বলে তাঁর কিছু থাকত না বিজ্ঞানের কথা বলতে পেলে। আর খাবার? সমরদা ছিলেন জীবন যাপনে সত্যিই অসাধারণ সাধারণ।

এরপর একটা দিনের উল্লেখ করি। দিনটা ছিল ৮ নভেম্বর, ২০২২। মঙ্গলবার। সমরদা বেশ কয়েকদিন আগের থেকেই ডায়েরিতে দাগ দিয়ে রেখেছেন। আমিও সব কাজ চুকিয়ে ঐ বিশেষ দিনের ঐ বিশেষ কাজটির জন্য দিন গুনছি। জানি শুভাশিষদা আছেন। সব ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। ঐ জন্য সমরদার কাছে একটু বকুনিও খেয়েছি। ওঁর মতো মানুষকে

এত ঝামেলার মধ্যে জড়াও কেন? শুভাশিষদা বলেন, সমরদার এই কাজটা ঠিক মতো করতেই হবে। তুমি কিছু ভেবো না, আমি আমার সব বন্ধু-বান্ধবদের বলে রেখেছি। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

এই ঠিকঠাক হয়ে যাবার কাজটি হল সমরদার একটি বই প্রকাশ। বইয়ের নাম — **বিজ্ঞান ইতিহাসে**। বইটির একটা ছোট্ট ভূমিকা আছে। এটি সমরদার একটি প্রাণান্ত পরিশ্রম করা কাজ। কাজটি সমরদার কাছ থেকে নেন নিরুপমা অধিকারী। যাঁর সঙ্গে সমরদার সম্পর্ক ছিল এক্কেবারে নিজের বোনের মতো। তিনি খুবই স্নেহ করতেন নিরুপমাকে। মাঝে কোভিড এল। নিরুপমার ফুসফুস ছিল কমজোরি। সহ্য করতে পারল না দানবীয় সময়ের ঝাপটা। সমরদা একদিন পুরুলিয়ার অনতিদূরে পাড়া নামের একটা জায়গায় এসেছেন। ওখান থেকেই ফোন করলেন। আমি দুঃসংবাদটি দিতেই তিনি ভেঙে পড়লেন। বললেন — 'সঞ্জয় এ তুমি আমাকে কি শোনালে, কি শোনালে! এও কি সম্ভব?' আমি সমরদার সেই হাহাকার জীবনেও ভুলব না। একজন মানুষ কত নিবিড়ভাবে স্নেহ করলে এবং কতটা নরম মনের হলে এভাবে ভেঙে পড়তে পারেন, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

থাক ও সব দিনের কথা। আসুন আমরা ৮ নভেম্বরে ফিরে যাই। আগের রাতেই ফোনে কথা হয়ে গিয়েছিল কিভাবে যাব। শুধু আগের রাতে বলব কেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই কথা চলছিল কিভাবে ওখানে কাজ হবে। কিভাবে গেলে সুবিধে হবে। আমি বলেছিলাম, আমি রাত্রের গাড়িতে গেলে অনেক ভোরে পৌঁছে যাব। আমাদের প্রোগ্রাম তো সেই বিকেলে। উনি জোরাজুরি করেন নি। কোনো ব্যাপারেই কাউকে খুব একটা জোর করতেন না। স্বাধীনতা দিতে পছন্দ করতেন। আমি যখন পৌঁছলাম ততক্ষণে ঘড়িতে দুটো বেজে গেছে। বললেন— স্নান করে এসেছ, না করবে? আমি বললাম, না, স্নান করব না। তাহলে হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি খাই নি, চল একসাথে বসা যাক। আমার ওষুধ আছে। আমি বললাম, আপনি এখনো খান নি? বললেন—বা রে, তুমি বাড়িতে আসবে আর আমি খেয়েদেয়ে ঘুমোব। এবার অমার অবাক হওয়ার পালা। একজন নব্বই ঊর্দ্ধ, বেশ কয়েকটা অপারেশন হয়ে যাওয়া অসুস্থ মানুষ পুরুলিয়া থেকে কোন একজন অখ্যাত মানুষ আসবে যে তাঁর রক্তের সম্পর্কের কেউ না, তাঁর পাড়ার কেউ না, আর্থিক সম্পর্কের কেউ না, চাকরি সূত্রের কেউ না, জ্ঞাতিদের মধ্যেও কেউ না; শুধুমাত্র মনের মিলের, স্বধর্মের একজন। তার জন্য এভাবে অপেক্ষা করা যায় আজকের দিনে! মনে পড়ে গেল তাঁর মুখে বহুবার শোনা এবং তাঁর বইয়ের পাতায় লেখা শেক্সপীয়ারের সেই বিখ্যাত কথা— 'What a piece of work is a man/how nobel in reason/how infinite in faculties/in form and moving/ how express and admirable/in action how like an angel/in apprehension how like a God/the beauty of the world/The Paragon of animal.'

একসাথে খাওয়া শুরু হল। চলতে লাগল টুকরো টুকরো কথা। খাওয়ার পর সমরদা একটু গড়িয়ে নিতে গেলেন। তিনটে কুড়িতে উঠলেন। ফোন করলেন। দু'জন এলেন। চা খেতে খেতে পরিচয় পর্ব শেষ হল। পোশাক বদলালেন। সুন্দর পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরলেন। পৌনে চারটায় বেরোলাম। সমরদা নিজে নব্বই বছরেও ড্রাইভ করেছেন। তবে আজ ড্রাইভার নিয়ে চললেন যাদবপুর অবসারিকা লয়েলকা, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৯২। সামান্য রাস্তা। সমরদা আগে, আমরা পেছনে। ছোট্ট ছোট্ট দু-একটা কথা। পৌঁছতেই শুভাশিষদা ও তাঁর সাথিরা এলেন। চারটে মানে চারটেতেই শুরু হল বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। তারকাখচিত অনুষ্ঠানের মধ্যমণি সমরদা। তিনি মুহূর্তে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আসর জমিয়ে দিলেন। গম্ভীর, গুরুত্বপূর্ণ কথাকে কিভাবে সহজ সরল করে বলা যায় তা সমরদার কাছে শেখা। যাইহোক, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে এলাম। সবাই চলে গেছে শুধু আমি ছাড়া। বললেন, তোমার ত ট্রেন সেই রাত্রে, চল গল্প করা যাক। অরেক প্রস্থ চা হল। অনেক গল্প হল। প্রচারবিমুখ মানুষটি কথার ফাঁকেই বকুনি দিলেন তাঁর কথা না শুনে বিজ্ঞান ইতিহাসে বইতে তাঁকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনগুলি ব্যবহার করার জন্য। আসলে সমরদারে নিয়ে লেখার সময় আশাবরীর পক্ষ থেকে আমি লিখেছি— 'সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।/'আমাদের' মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। (কবি বলেছেন আমার)/কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে/অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।'

রাতে খাবার খাওয়ার পর শুভরাত্রি জানিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম। শেষবারের মতো আমার সমরদাকে শ্রদ্ধা জানালাম। ফিরতে হবে পুরুলিয়া।

আজ সমরদা নেই। তবু তিনি আছেন। আসলে আমরা তো জানি 'যে শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ, কেহ কভু তাদের করেনি সম্মান'। সমরদা মারা যান নি, তিনি বিজ্ঞান সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাই তো আমার দাদা—অমর সমর বাগচী।

ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত : কর্পোরেট নয় মানুষের সেবক (১৯৪৯-২০২৩)

আশীষ লাহিড়ী

জন্ম জামশেদপুরে। কৈশোর কেটেছে রানিগঞ্জে। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। বাড়িতে সাহিত্য আর সংগীতের আবহ ছিল। এক সময়কার বিখ্যাত লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর *মহাস্থবির জাতক* বাবার খুব প্রিয় উপন্যাস। সেই বইয়েরই চরিত্রর নামে ছেলের নাম রাখলেন স্থবির, লোকে ভুল বুঝবে জেনেও। সেই ছেলে বড়ো হয়ে কলকাতার আর জি কর কলেজে ডাক্তারি পড়তে এল। গত শতকের সত্তর দশক। এই পচাগলা সমাজটাকে বদলে ফেলার জন্য একদল আদর্শবাদী মেধাবী তরুণ তখন প্রাণ বাজি রেখে রাস্তায় নেমেছিল। স্থবির মাছের মতো সেই স্রোতে মিশে গেল। পড়াশোনা, কেরিয়ার সব ছেড়ে বিপ্লবের জন্য চলে গেল সুন্দরবনে। সেখানে কয়েক বছর বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনের চেষ্টায় মেতে রইল। অবশেষে একদিন ধরা পড়ল। জেলে গেল। ততদিনে বিপ্লবের স্রোত মন্দীভূত। জেল থেকে বেরিয়ে স্থবির ঠিক করলেন ডাক্তারি পড়া শেষ করবেন। কিন্তু ততদিনে চারটি বছর পেরিয়ে গেছে যে। সহৃদয় মাস্টারমশাইরা বললেন, তুমি একসঙ্গে যদি সবকটা পরীক্ষা পাশ করতে পার, তাহলে বছর নষ্ট হবে না; নইলে একেবারে ফার্স্ট ইয়ার থেকে কেঁচে গণ্ডূষ। স্থবির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলেন। পাশে রইলেন মাস্টার মশাইরা, বন্ধুরা। সগৌরবে পাশ করলেন ডাক্তারি।

এদিকে মনের মধ্যে দ্বিধা : 'বিপ্লবের পথ ছেড়ে ডাক্তারি পড়ে আমি কি সুবিধাবাদের আশ্রয় নিচ্ছি?' এক বিপ্লবী বন্ধু তাঁকে বোঝালেন, 'এ-ও এক ধরনের সাবভার্শান! ...রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলি। এবার ডাক্তার হয়েও কত কী করা যায়, ভেবে দেখিস'। ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত একটা আলো দেখতে পেলেন। মানুষের জন্য ডাক্তারি, কর্পোরেটের জন্য নয় — এই তাঁর ইষ্টমন্ত্র।

বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞর কাছে কঠিন নবিশি শুরু হল। পাশাপাশি 'চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতলে দিনে গড়ে জনা পঞ্চাশেক রুগি' দেখার তালিম চলল এক নাগাড়ে। বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাবে তাঁর মাস্টারমশাই সরাসরি না বলে দিলেন। বললেন, হাতেকলমে এই যে এতগুলো রুগি দেখার অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করছ, এটাই আসল শিক্ষা। স্থবির মেনে নিয়েছিলেন মাস্টামশাইয়ের যুক্তি। ক্রমে তাঁর মাথায় চেপে বসল ওই অন্তর্ঘাতের ভাবনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কর্পোরেট জগতের খপ্পর থেকে বার করে আনতে হবে। প্রতিদিনই তারা প্রচণ্ড দামি নতুন নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়ে আর ক্যান্সার সারানোর অবাস্তব দাবি জানিয়ে রুগিদের মনে বৃথা আশা জাগায়। রুগির আত্মীয়স্বজন ঘটিবাটি বেচে আর এরা জমায় মুনাফার পাহাড়। কিন্তু এদের হাতে এত ক্ষমতা, এত টাকা, যে এ-চক্র ভাঙার সাধ্য কারোরই নেই। তাই এই সিস্টেমের মধ্যে থেকেই, সত্যিকারের দরকারি ওষুধগুলো ব্যবহার করে, রুগিদের মিথে ছলনায় না-ভুলিয়ে কষ্টের উপশম ঘটানোই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের ব্রত। চিকিৎসক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সফল। রুগিরা তাঁর কাছে কখনো কর্পোরেটের রোবট-সদৃশ 'এফিসিয়েন্সি'র পরিচয় পাননি, পেয়েছিলেন মানুষ-ডাক্তারের স্নেহার্দ্র করস্পর্শ।

ঠিক একইভাবে, অ-পরীক্ষিত কোভিড ভ্যাকসিন বাজারে ছাড়া নিয়ে কর্পোরেট জগতের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিনি। একের পর এক গবেষণার ফলাফল উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছিলেন, কোভিড ভ্যাকসিনের নিরর্থকতা। তাঁর মতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনস্বাস্থ্যর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোভিডের মোকাবিলা অনেক সার্থকভাবে করা যেত। তাঁর এই মত নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। বিরোধীরা বলেছিলেন, ভ্যাকসিন বর্জন করলে এমনিতেই দিশাহারা জনগণ আরও

বিপদ ও নৈরাশ্যের মধ্যে গিয়ে পড়বে। বৈজ্ঞানিক বিচারে কোনটা ঠিক, তা বলার অধিকারী আমি নই। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় তা হল, যে-মন নিয়ে তরুণ স্থবির একদিন সব ছেড়েছুড়ে বিপ্লবের পথে হেঁটেছিলেন, সেই একই মন নিয়ে তিনি সারা জীবন ডাক্তারি করে গেছেন। অর্থ, যশ হেলায় উপেক্ষা করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কর্পোরেট রূপধারণ যে একেবারে মৌলিক অর্থে জনবিরোধী, এটা শুধু তত্ত্বে নয়, প্রয়োগেও দেখিয়ে গেছেন তিনি।

নকশালবড়ি আন্দোলন রাজনৈতিক অর্থে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতে কিছু অমূল্য ফসল ফলিয়ে গেছে। নানা-গুণান্বিত ডাক্তার স্থবির দাশগুপ্ত তার অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। উঁচুদরের কাব্যময়, দর্শন-ঋদ্ধ বাংলা গদ্য লিখতেন তিনি। অল্পকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনী *শীতলপাটি বিছিয়ে যারা* (লা স্ত্রাদা)। ওপরের তথ্যগুলি মূলত ওই বই থেকেই নেওয়া। এমন একজন গুণী, সজ্জন, আদর্শবাদী, নির্ভীক, জনদরদি চিকিৎসকের প্রয়াণ বাঙালি সমাজকে দীন করে দিয়ে গেল। একই সঙ্গে, এমন একজন মানুষ যে এই আদর্শহীনতার পরিমণ্ডলেও এতদিন ধরে লড়াই করে গেলেন, সেই স্মৃতি আমাদের এই ঋষিবাক্যে উদ্বুদ্ধ করে চলবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে-বিশ্বাস শেষ অবধি রক্ষা করব। উমা

প্রয়াত তপোব্রত সান্যাল (১৯৪০-২০২৩)

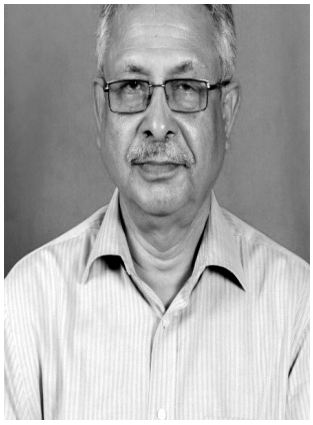

গত ৩ আগস্ট ২০২৩ শ্রদ্ধেয় তপোব্রত সান্যাল প্রয়াত হন। তপোব্রতবাবু কে উৎস মানুষের পাঠকরা তা জানেন। মূলত নদী-বন্যা-ভাঙন নিয়ে লেখালিখি করতেন। আমরা তার বাইরে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ওঁকে লেখার অনুরোধ করিনি। দশম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা উনি দিয়েছিলেন। সেটি জানুয়ারি ২০১৮-তে লিখিত আকারে পত্রিকায় বেরোয়। উৎস মানুষের প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন তপোব্রতবাবু।

তপোব্রত সান্যাল কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চিফ হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ার পদাধিকারী ছিলেন। ২০০০ সালে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে নানান সংস্থাকে পেশাদারি পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে লেখালিখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ২০১৬ পর্যন্ত ন্যাশনাল জুট বোর্ডের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তপোব্রতবাবুকে দেশের প্রথম সারির নদী বিশেষজ্ঞ বলে ধরা হত। দেশে প্রথম তাঁরই তত্ত্বাবধানে নদীতল রক্ষা করার জন্য পাটের কাপড় বিছানো কাজ শুরু হয়। ১৯৮৯-'৯০-এ হুগলী নদীতে সে কাজ প্রথম শুরু হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ তপোব্রত সান্যাল লেখা চাইলে বলতেন 'দেখছি কতটা কী করা যায়'। কিছুদিন পরই লেখা তৈরি হয়ে গেলে কাউকে পাঠিয়ে দিতে বলতেন। পূর্ব-কলকাতা জলাভূমি পরিবেশবিদ তথা প্রযুক্তিবিদ প্রয়াত ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ বলতেন, 'তপোব্রতদা হুগলী নদীকে হাতের তালুর মতো চেনেন'। দুজনেই তখনকার শিবপুর বিই কলেজের একই বিষয়ের ছাত্র ছিলেন। তপোব্রত সান্যাল ওঁর কয়েক বছরের সিনিয়র ছিলেন।

উৎস মানুষ প্রকাশনার 'বাঁধ বন্যা বিপর্যয়' বইতে তপোব্রতবাবুর কয়েকটি লেখা সংকলিত হয়েছে। ওঁর প্রয়াণে দেশ এক বিরাট মাপের প্রযুক্তিবিদকে হারালো। তবে ঐ মাপের প্রযুক্তিবিদকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারে নি কোনো সরকারই। তাই হয়। এসব মানুষের দেশকে অনেক কিছু দেওয়ার মতো পেশাদারি জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতাদের দূরদর্শিতার অভাবে বা তাঁদের বৃত্তের বাইরে থাকাতে তপোব্রত সান্যালরা শাসকদের থেকে ডাক পান না। যার ফল ভুগতে হয় আমজনতাকে। বছরের পর বছর নদীতে পলি পড়তে পড়তে জল ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে নদীর স্বাস্থ্যহানি হয়। বন্যা তো প্রতিবছরই হয়। তপোব্রতবাবুদের সামনে নতজানু হয়ে পরামর্শ নিলে হয়ত বিপর্যয় থেকে কিছুটা উদ্ধার পাওয়া যেত। নীরবে নিভৃতে নিজের কাজ করে গেছেন, তাই প্রচারের আলো তাঁর ওপর পড়ে নি। চলেও গেলেন নীরবে। প্রয়াত তপোব্রত সান্যালকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

উমা

হুগলি নদীর নোনা জল

তপোব্রত সান্যাল

এ কথা সকলেরই জানা যে, সমুদ্রের জল যেমন নুনে পোড়া, নদীর জল তেমন নয়। নদীর জলে সাধারণত নুন থাকেই না, উল্টে এই জলের স্বাদও ভাল। নদীতীরবর্তী বহু মানুষ নদীর জল দিয়ে রান্নাও করে। ব্যতিক্রম সমুদ্র-লাগোয়া নদীগুলি। প্রতিদিন জোয়ার-ভাঁটার সময় সমুদ্রমুখ থেকে সমুদ্রে নোনা জল নদীর বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত যাওয়া-আসা করে। তাই স্বাভাবিক কারণেই ওই জায়গার জল কম-বেশি লবণাক্ত হয়। হুগলি নদী আসলে ভাগীরথীর জোয়ার-প্রভাবিত অংশ হওয়ায় অঞ্চল ভেদে এর জলও কম-বেশি নোনা হয়।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, লবণাক্ততা বলতে ঠিক কী বোঝায়। লবণাক্ততা হল নদীর জলে দ্রবীভূত, মানে গুলে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের মাত্রা সূচক। মোদ্দা কথায় কতটা জলে কতটা নুন। প্রতি হাজার একক ওজনে কতটা একক ওজনের দ্রাব (Solute) জলে আছে, সেটা দিয়ে লবণাক্ততার মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

সমুদ্রের জলের গড় লবণাক্ততা মোটামুটি ৩৪.৫ পিপিটি (Parts per Thousand)। এর অর্থ, প্রতি হাজার একক ওজনের সমুদ্রের জলে ৩৪.৫ একক ওজনের রাসায়নিক যৌগ দ্রবীভূত আছে। জলকে বিভিন্ন কাজে লাগানোর জন্য যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়, লবণাক্ততার মাত্রা তার একটা গোদা হিসাব।

শুধু জোয়ারের জলে দ্রবীভূত রাসায়নিক যৌগই নদীতে লবণাক্ততার একমাত্র উৎস নয়। মাটি ধুয়ে আসা বৃষ্টির জলেও (surface run-off) অনেক রাসায়নিক যৌগ থাকে। যেমন, চাষের কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকও বৃষ্টির জলে ধোওয়া মাটির সঙ্গে বাহিত হয়ে নদীতে এসে মেশে। তবে নদীর জলে লবণাক্ততার প্রধানতম উৎস সমুদ্র থেকে আসা জোয়ারের জলই।

হুগলি নদীতে লবণাক্ততার নিয়ামক কারণ তিনটি। (ক) উজান-থেকে-আসা লবণমুক্ত জলের পরিমাণ, (খ) জোয়ারের সঙ্গে ঢোকা লবণাক্ত জলের পরিমাণ এবং (গ) উজান-থেকে-আসা এবং জোয়ারের সঙ্গে ঢোকা জলের মিশ্রণের প্রকৃতি (diffusion characteristics)। পরীক্ষাগারে দেখা গিয়েছে যে, হুগলি নদীর জল মোটামুটি সুমিশ্রিত (well-mixed)। অবশ্য কোথাও কোথাও ব্যতিক্রমও আছে। নদীতে এসে-পড়া সব রাসায়নিক যৌগ একই রকম দ্রবণীয় নাও হতে পারে। আবার হুগলি নদীর গর্ভ-সন্নিহিত জলস্তর ওপরের জলস্তরের চেয়ে তুলনায় বেশি লবণাক্ত।

হুগলি নদীতে লবণাক্ততা জলস্তর ভেদে এবং স্রোতপথ ভেদে ভিন্ন। এর মূল কারণ, উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ এবং সেইসঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা জোয়ারের জলের পরিমাণের নিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীলতা। শুখা মরশুমে উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ কমে গেলে নদীর জলের লবণাক্ততা বেড়ে যায়। আবার বৃষ্টির মাসগুলিতে উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ যখন বাড়ে, তখন নদীর জলে লবণাক্ততা কমে যায়। আর এটা সবার জানা, সমুদ্রমুখ থেকে দূরত্ব যত বেশি হয়, হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততাও আনুপাতিক হারে কমে যায়। ঠিক এর উল্টোভাবে, মোহনা অঞ্চলে হুগলি নদীর জল তুলনায় বেশি লবণাক্ত। হলদিয়ার কাছে হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততার মাত্রা ১২ থেকে ১৮ পিপিটি-র মধ্যে থাকে।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ফরাক্কায় ব্যারাজ (সরন্ধ্র বাঁধ) নির্মাণের আগে গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে হুগলি নদীতে জল আসত অবাধে। শুখা মরশুমে হুগলি নদী মুখ্যত জোয়ারের জলেই সঞ্জীবিত থাকত। সে সময়ে বোধগম্য কারণে গুগলি নদীতে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যেত। আবার বর্ষার সময় জল বেড়ে গিয়ে ভাগীরথীর জলে হুগলি নদীর যেন নতুন প্রাণসঞ্চার হত। তখন হুগলি নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ যেত অনেকটা কমে।

এখন পরিস্থিতির বদল হয়েছে। উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। ফরাক্কায় গঙ্গার জল আসার পরিমাণ এখন প্রত্যাশিত সীমার নীচে। ফলে উজান-থেকে-আসা জলের পরিমাণ কম হলেও আগের মতো অনিয়ন্ত্রিত নয়। এজন্য ফরাক্কার নীচে ভাগীরথীর হাল আগের চেয়ে ভাল হয়েছে বিশেষ শুখা মরশুমে। কলকাতার নীচে হুগলি পয়েন্ট (গুগলি নদী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল) পর্যন্ত অংশে পলি সঞ্চয় কমেছে, কমেছে বানের (bore)

পৌনঃপৌনিকতাও। অবশ্য এসবের সঙ্গে হুগলি নদীর জলে লবণাক্ততার তেমন সম্বন্ধ নেই, যা আছে তা হল, পলিসঞ্চয়ের ব্যাপারটা।

হুগলি নদীতে পলিসঞ্চয়ের একটা বড় কারণ, জলে লবণাক্ততার তারতম্যে ঘনত্বের (density) অসাম্য। এর ফলে অনুকূল ঔদক পরিস্থিতি সাপেক্ষে (hydraulic condition) নদীর গর্ভতল ঘেঁষে কোথাও কোথাও ঘনত্ব-জনিত স্রোত (density current) সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এর ফলে নদীগর্ভের পলি অপসারিত হয়। হুগলি নদীর পলি সংবহন প্রক্রিয়া (Sediment Transport Process) খুব জটিল। ঘনত্ব-জনিত স্রোত পলিসংবহন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এসব ছাড়া লবণাক্ততার ব্যাপারে হুগলি নদীর প্রবাহপথের ভূমিতির (geometry) ভূমিকা আছে। হুগলি নদীর প্রবাহপথ সরল নয়, উত্তল-অবতল সঙ্কুল। যেখানে অবতল বক্রিমা (concave bend), সেখানকার গভীরতা আশেপাশের গভীরতার চেয়ে বেশি। এই গভীরতাই প্রমাণ ভাঁটার টানের প্রবল। ভাঁটার টান বেশি বলে লবণাক্ততাও তুলনায় সেখানে কম। যেখানে বক্রিমা উত্তল (convex), সেখানে জোয়ারের আধিপত্য, গভীরতাও সেখানে তুলনায় কম এবং লবণাক্ততাও অপেক্ষাকৃত বেশি।

হুগলি নদীর জলে কেবল রাসায়নিক যৌগেরই অস্তিত্ব নেই। হুগলি নদীর জলে সংবাহিত হয় বিপুল পরিমাণ নানা আকার ও বৈশিষ্ট্যের পলিকণা। লবণমুক্ত ও লবণযুক্ত জলের মিশ্রণকে এই বিপুল পলিভার কতটা প্রভাবিত করে, তা নিয়ে কোনো বিশদ গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের নির্যাস হল যে, হুগলি নদীর জলে অঞ্চল ভেদে ও কাল ভেদে লবণাক্ততার মাত্রার গড় নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, কারণ নিয়ামক কারণগুলি নিত্য পরিবর্তনশীল। এইসব কারণ মুখ্যত প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত। যাই হোক, হুগলি নদীর লবণাক্ততার বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়। প্রায় চার দশক আগে পুনের সেন্ট্রাল ওয়াটার পাওয়ার রিসার্চ স্টেশনে (CWPRS) এ বিষয়ে সমীক্ষা হয়েছিল। তারপরে এ দেশে এ নিয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

উৎস মানুষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

পরিবেশ নিয়ে ছড়া

প্রশান্ত দাস

গাছে পেরেক

গাছের গায়ে লাগাই পেরেক
নিজের প্রচার বাড়াতে
তাদেরও যে যন্ত্রণা আছে
ভুলে যাই তা মানতে।
গাছেদের কাছে কতভাবে ঋণী
এতো সকলেই জানি
গাছেদের প্রাণ বাঁচাতেই হবে
তা কী আমরা মানি?
গাছেরাই দেয় জীবনসুধা
বিষাক্ত কার্বন নেয় শুষে
এমন উপকারী বন্ধু যে আছে
বুঝল না মানুষে।

পাঁচিলে কাঁচ

বাড়ির পাঁচিলে লাগালে কাঁচ
চুরি হয়ত কমবে
কিন্তু ভেবে দেখেছ কি
কত প্রাণী তাতে মরবে?
কাঠবেড়ালি-ছুঁচো-ইঁদুর
কত যে সব অজানা প্রাণী
চলে তারা সে পথ দিয়ে
হয় যে তাদের প্রাণহানি।
তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়
পাঁচিলে কাঁচ কখনও নয়
চলুক প্রাণীরা মহা আনন্দে
তাদের চলা যে ছন্দময়।

বায়ুমণ্ডল পরিচয়

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে বিশাল এক বায়বীয় সমুদ্র — আমাদের বায়ুমণ্ডল। মানুষের অবস্থান এই সমুদ্রের একদম তলায়, পৃথিবীর গোলকের পিঠের ওপর। বাইরের মহাশূন্যের চরম পরিবেশ থেকে এ একটা পেলব উষ্ণ, বর্ম হিসেবে আমাদের রক্ষা করে। ধরে নেয়া হয় এ সমুদ্র ৩২০ কিমি গভীর, যদিও তত্ত্বগতভাবে এর কোনো ঊর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৮% মাটির ওপর ৩০ কিমি উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাকি ২% অত্যন্ত হাল্কা হয়ে কোনো নির্দিষ্ট ঊর্দ্ধসীমা ছাড়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। মাথার ওপর গ্যাসের এই সমুদ্রের চাপ, যা প্রায় ১২ হাজার কিলোগ্রাম, প্রতিটি মানুষ নিজের অজান্তে বয়ে বেড়াচ্ছে। ভূ-গোলকের আয়তনের তুলনায় বায়ুমণ্ডল পেঁয়াজের শুকনো খোসার মতো পাতলা। আবহাওয়ার সবরকম চমকপ্রদ ঘটনা — যেমন ভীতিপ্রদ বজ্রপাত, বিধ্বংসী তীব্র সামুদ্রিক ঘূর্ণবাত (সাইক্লোন)—এরই ১৫ কিমি উচ্চতার মধ্যে সীমিত।

বায়ুমণ্ডলের বৈচিত্র — যে সব বিচিত্র আর বিস্ময়কর উপাদান দিয়ে এই ভূমণ্ডল তৈরি তার মধ্যে বায়ুমণ্ডলের এই রাসায়নিক আবরণ থেকে আশ্চর্য আর কিছুই নয়। এটি কতগুলো গ্যাসের, মূলত নাইট্রোজেন, (৭৮%) ও অক্সিজেন (২১%) গ্যাসের মিশ্রণ। বাকি ১% সামান্য পরিমাণ গ্যাসের সমষ্টি যথা কার্বন ডাই অক্সাইড, ওজোন ইত্যাদি। মাধ্যাকর্ষণ এই গ্যাসগুলোকে পৃথিবীর সঙ্গে ধরে রেখেছে। এদের সম্মিলিত প্রভাব বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব করেছে আর অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণীর জীবন অক্সিজেন নির্ভর। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব প্রাণী অক্সিজেন নিই। রক্ত প্রবাহ জীব দেহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সব পরিত্যাজ্য ক্লেদ বহন করে নিয়ে আসে। ফুসফুসের ভেতর এক ধরনের দহন প্রক্রিয়া দিয়ে অক্সিজেন সেই ক্লেদাক্ত রক্ত শুদ্ধ করে দেয়। নাইট্রোজেনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শুদ্ধ অক্সিজেনের এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার তীব্রতা আমাদের সহনশীলতার বাইরে। নাইট্রোজেনের মিশ্রণ অক্সিজেনকে তরল করে দহন প্রক্রিয়া আমাদের সহ্যসীমার মধ্যে এনে দেয়।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে ০.০৩% । এই সামান্য পরিমাণ দিয়েই সে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটায়। এর সাহায্যে ফটোসিন্থেসিস নামের এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ, সূর্যরশ্মির শক্তিকে তাদের খাদ্যে পরিবর্তিত করে নেয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে অক্সিজেন নিঃসৃত হয়ে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ২০ থেকে ৫০ কিমি উচ্চতায় অক্সিজেনের (অণুর) দ্বারা শোষিত হয়ে ওজোন অণু সৃষ্টি করতে খরচ হয়ে যায় । পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত সে ক্ষতিকারক রশ্মি পৌঁছতে পারে না। আমরা রক্ষা পাই। মহাশূন্য থেকে প্রতিনিয়ত অগনন উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ছে। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে এরা ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। বায়ুমণ্ডল একটা বিশাল শীততাপ নিয়ন্ত্রক হয়ে পৃথিবীর তাপমান প্রাণের অনুকূল একটা সীমার মধ্যে রেখেছে। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এবং জলের এ এক অফুরান উৎস। মহাশূন্যের যে কোটি কোটি ঘন কি.মি. বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন তাতে তাঁরা দেখেছেন যে সেখানকার ৯০% বস্তু সবচেয়ে লঘু গ্যাস হাইড্রোজেন হিসেবে রয়েছে। বাকিটা মূলত দ্বিতীয় লঘু মৌল হিলিয়াম গ্যাস। শুদ্ধ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম বিশ্বে এত অপর্যাপ্ত অথচ আমাদের বায়ুমণ্ডলে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। মহাজাগতিক প্রবণতার এক অতুলনীয় বৈপরীত্যে আমাদের মাথার ওপরের সমুদ্রটি দুর্লভ ভারী গ্যাসে তৈরি।

কিভাবে এই অনন্য বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়েছিল আর মহাজাগতিক কোন খামখেয়ালিতে বিশাল পরিমাণ হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম পৃথিবী বেষ্টন করে থাকা বায়ুমণ্ডল থেকে উবে গেল?

বায়ুমণ্ডলের জন্ম — এ তত্ত্ব এখন স্বীকৃত যে লক্ষ লক্ষ বছর আগে কল্পনাতীত প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ আমাদের সূর্যকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। সে আলোড়নের তীব্রতায় সূর্যের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তাপের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ অংশ ঠাণ্ডা হতে থাকল এবং পৃথিবীর মতো গ্রহগুলো তৈরি হতে থাকলো। সেই শিশু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এতই দুর্বল ছিল যে তা হাল্কা গ্যাসগুলো

ধরে রাখতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বন্দী থাকা ভারী গ্যাসগুলো ঠাণ্ডা আর সঙ্কুচিত হতে থাকা পৃথিবীর কঠিন আবরণ থেকে বুদবুদ হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল পৃথিবীর ফাটল আর আগ্নেয়গিরি দিয়ে। এগুলো ছিল নাইট্রোজেন, মিথেন আর কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড। এই প্রতিটি নিষ্ক্রমণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তৈরি হচ্ছিল। মহাশূন্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের পরিবর্তে আকাশ নীল রং ধরছিল। মেঘ তৈরি হতে থাকল আর মুষলধারে বৃষ্টি পৃথিবীর আদিম আবরণের উপত্যকাগুলোতে জমে সমুদ্র তৈরির সূচনা করল। এই পরিস্থিতিতে এককোষী ব্যাক্টেরিয়ারা আবির্ভাব হল, যারা মিথেনের ওপর ক্রিয়া করে অদ্ভুতভাবে একে কার্বন ডাই অক্সাইডে রূপান্তরিত করল। অনড় গ্যাঁজলা দিয়ে তৈরি একটা শ্যাওলা সমুদ্রতট ঢেকে দিল। প্রাণের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট তৈরি হল।

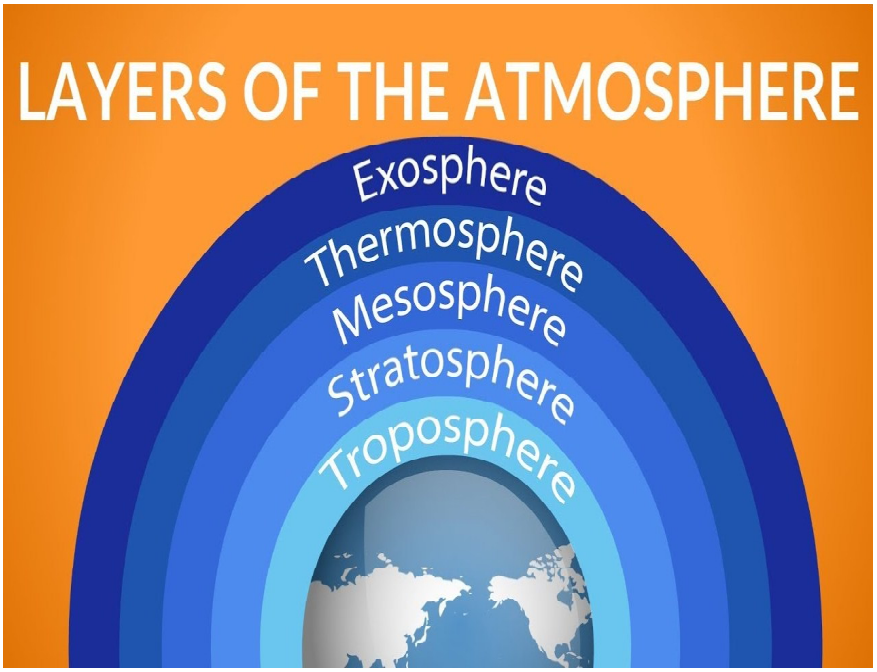

প্রাণের সূত্রপাত সে সময়কার বায়ুমণ্ডলের আবার বিবর্তনের সূচনা করল। প্রথমদিকের উদ্ভিদের পচে যাওয়া অংশ আর প্রথমদিকের প্রাণীদের বর্জ্য পদার্থ ধীরে ধীরে সেই পরিবেশ গড়ে তুলতে লাগল যার ভেতর প্রাণ বেঁচে থাকবে ও সমৃদ্ধ হবে। অর্থাৎ প্রাণের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের গঠন সেইভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল যাতে প্রাণেরই সহায়ক হয়।

বায়ুমণ্ডলের গঠন — এই গভীর আচ্ছাদনটি সব উচ্চতায় সমান ঘনত্বের নয়, সমকেন্দ্রিক চারটি গোলাকার স্তরের সমষ্টি, প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য আলাদা।

পৃথিবীর ঠিক ওপরের স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে ট্রোপোস্ফিয়ার। এটা সবচেয়ে ভারী আর আমাদের জন্য বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাতাসের ভরের তিন চতুর্থাংশ এই স্তরে আছে আর আছে মোটামুটি প্রায় সব জলীয় বাষ্প আর কার্বন ডাই অক্সাইড। ট্রোপোস্ফিয়ারে তাপমান উচ্চতার সঙ্গে ক্রমশ কমতে থাকে তার ওপরের পরবর্তী স্তর পর্যন্ত। এ দুই স্তরের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় ট্রোপোসজ। এর গড় উচ্চতা মেরু অঞ্চলে ৮ কিমি যেখানে তার তাপমান -৫৬° আর বিষুব রেখা অঞ্চলে ২৮ কিমি গড় উচ্চতা আর তাপমান -৮০° সেলসিয়াস। পৃথিবীর ওপরের দ্বিতীয় স্তরটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। বায়ুমণ্ডলের ভরের প্রায় এক চতুর্থাংশ এই আবরণটির অবদান। ট্রোপোস্ফিয়ারের অভিজ্ঞতা থেকে আশা হয় যে আমরা যতই ওপরের দিকে যাব ততই তাপমান কমতে থাকবে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে তা নয়। এর প্রথম ৮০ কিমি তাপমান প্রায় একই থাকে তারপর এটা বাড়তে থাকে।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সবচেয়ে উঁচু অংশকে ওজোনোস্ফিয়ার বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের এ সেই অংশ যে অংশে সূর্যের প্রাণঘাতী অতিবেগুনি রশ্মি অক্সিজেন অণুর দ্বারা শোষিত হয়ে ওজোন অণু সৃষ্টি করতে ব্যায়িত হয়ে যায়। পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের স্তরটি, এক্সোস্ফিয়ারে আছে শুধু হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম।

কাঁচঘর পৃথিবী

পৃথিবীর ওপরে সূর্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে যখন তার রশ্মি বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে আসে। পৃথিবী বেষ্টন করে থাকা বিশাল বুদবুদটি তখন তার সঙ্গে জুড়ে থাকা শীততাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। সূর্যের রশ্মি হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘের বিকিরণ হিসেবে পৃথিবীতে আসে। এই তরঙ্গ দৈর্ঘের বিকিরণের কাছে বায়ুমণ্ডল পুরোপুরি স্বচ্ছ। তার থেকে বায়ুমণ্ডল কোনো তাপ আহরণ করতে পারে না। এই বিকিরণ পুরোটাই তাই মাটিতে পড়ে তাকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত মাটি থেকে তখন তাপ বিকিরণ হতে থাকে, তবে সে তাপ দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘের। বায়ুমণ্ডলের বেশ কিছু উপাদান সেই বিকিরণ শুষে নিতে সক্ষম আর এতেই বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের তাপের উৎস যেহেতু পৃথিবী তাই আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে উঠি অর্থাৎ দূরে যাই ততই আমরা কম তাপ অনুভব করি।

শীতের দেশে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ফসল ফলাতে একধরনের ছাউনি তৈরি করা হয় যার ছাদ, দেয়াল সব কাঁচের। হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘের সূর্যের বিকিরণ এতে বিনা বাধায় ঢোকে কিন্তু দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘের বিকিরণ বন্দী হয়ে ছাউনির ভেতরের বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে।

তাই এই প্রক্রিয়াকে 'কাঁচঘর' প্রভাব বলা হয় আর বায়ুমণ্ডলের যে উপাদানগুলো এটা ঘটায় তাদের 'কাঁচঘর গ্যাস' বলা হয়। সেগুলো হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন আর জলীয় বাষ্প। এই কাঁচঘর প্রভাবের ফলেই আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমান প্রাণের অনুকুল রয়েছে। এটা না থাকলে বায়ুমণ্ডলের তাপমান এত কম হত যে তা প্রাণের অনুকুল থাকত না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কয়লা ও খনিজ তেলের ব্যবহার বেড়ে গেছে, আর তাই বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। বেশি পরিমাণ তাপ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হচ্ছে, পৃথিবী গরম হচ্ছে।

এই প্রবণতা আটকানো না গেলে বিজ্ঞানীরা সুদূরপ্রসারী কুফল আশঙ্কা করছেন। উত্তপ্ত পৃথিবীতে কৃষি সম্ভব হবে কেবলমাত্র উত্তর অক্ষাংশে। পৃথিবীর মরুভূমিগুলো আরও ছড়াবে। গ্রীষ্মমণ্ডলীর বৃষ্টিস্নাত বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে। হিমবাহগুলো গলতে থাকবে , তাই সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে থাকবে। কিছু কিছু জনপদ জলের তলায় চলে যাবে। অধিকাংশ জীববৈচিত্র ও সামুদ্রিক প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর বাসযোগ্য অঞ্চল বিপুলভাবে কমে যাবে।

সে কারণে বায়ুমণ্ডলের এই ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন রোধ করার উপায় অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পাদটীকা ১ : ব্যাক্টেরিয়া

মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবে ব্যক্টেরিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যাক্টেরিয়ার আবির্ভাব কি ভাবে হল সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান বিজ্ঞানীরা এখনও করতে পারেন নি। গবেষণা চলছে।

পাদটীকা ২ : আকাশের রঙ

সূর্যের বিকিরণ যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছয় তখন বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের (প্রধানত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন) অণুগুলো দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরণের পরিমাণ নির্ভর করে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘের ওপর। তরঙ্গ দৈর্ঘ যত হ্রস্ব বিচ্ছুরণ তত শক্তিশালী। তাই অন্যান্য রঙের তুলনায় নীল রঙের বিচ্ছুরণ আমাদের চোখে বেশি তীব্র হয়ে আসে। আমরা তাই আকাশ নীল দেখি। সূর্যের বিকিরণে বেগুনি আলোও থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু আমাদের চোখ নীল আলোর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট।

উ মা

উৎস মানুষের বই এখন থেকে *প্রতিক্ষণ* দপ্তরে ৫, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা -১২ পাওয়া যাবে।

(স্টেট ব্যাঙ্কের দোতলায়/ পুঁটিরামের পাশে)

শৈশবের ভয়ের চারা, বেশি বয়সে মহীরূহ

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

মনে পড়ে সেই ১৯৫৮-তে প্রকাশিত আলফ্রেড হিচককের বিখ্যাত সিনেমা, ভার্টিগোর কথা? ছবির নায় জন 'স্কটি' ফার্গুসন এক জটিল মনস্তত্ত্বের মানুষ। ছবি শুরু হচ্ছে সেই বিখ্যাত দৃশ্য দিয়ে, যেখানে ফার্গুসনের সহকর্মী উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে তাঁর চোখের সামনেই অনেক নীচে পড়ে গেলেন। আতঙ্কিত ফার্গুসনের মনে গেঁথে গেল উচ্চতা ভীতি বা অ্যাক্রোফোবিয়া।

আলোচনা শুরু করার আগে কতগুলো পরিভাষার অর্থ—

Fear এবং anxiety বা ভয় এবং উদ্বেগ যদি অনুভূতির স্বল্প প্রকাশ হয়, ফোবিয়া বা ভীতি হল সেই অনুভূতিরই গুরুতর রূপ। ভয় হল এক অস্বস্তিকর অনুভূতি, যেটি শিশুর শারীরিক এবং মানসিক এবং আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিশুটি সচেতনভাবেই কোনও জিনিসকে ভয় পেতে শুরু করে। সেই জিনিস বা বস্তুটির বাস্তব অস্তিত্ব থাকতেও পারে বা সেটি কাল্পনিকও হতে পারে। শিশুটিকে যুক্তি দিয়ে বোঝালে সে এই ভয়ের কবল থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত করে ফেলতে পারে। কিন্তু ভূতি বা ফোবিয়া যদি একবার মনের মধ্যে গেড়ে বসে, তাকে উপড়ে ফেলা খুব কঠিন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ফোবিয়া বা ভীতি শিশুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ছন্দে ব্যাঘাত ঘটায়।

এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, সব শিশুর মনেই স্বভাবজাত একটি ভয়ের অনুভূতি থাকে। উদ্বেগের ঘাড়ে চেপে শিশুমনে সিঁদ কাটে এই ভয়। ভয়ের কিছু অনুভূতি সহজাত, কিছুটা সে অর্জন করে পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন ধরুন, শিশুর ৮-৯ মাস বয়সে শুরু হয় stranger anxiety বা অপরিচিতের উদ্বেগ। বাবা-মায়ের নিরাপদ ঘেরাটোপ এবং আশ্রয় থেকে হঠাৎ করে অপরিচিত মানুষের সংস্পর্শে আসার একটা সহজাত সংশয়। আরেকটি ভয়ের অনুভূতি হল আহরিত। যেমন যখন থেকে তাকে শেখানো হয়, যে পড়ে গেলে বা আগুনের সংস্পর্শে এলে সেটি একটি যন্ত্রণাদায়ক এবং শারীরিক ক্ষতিকারক অনুভূতি। এই আশঙ্কা বা ভয়ের বোধটি ২-৩ বছর পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত। কিন্তু এর পরেই শিশুদের মনন ও মগজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তারা তাদের মনের ভেতরের অহেতুক ভয়ের অনাবশ্যক অনুভূতিগুলোকে ছাঁটতে শুরু করে। ফলে তারা বুঝতে শেখে যে, সব অপরিচিত মানুষকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। সব জায়গায় পড়ে গেলে বা সাবধানে আগুন ব্যবহার করলে তার থেকে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এই বোধোদয়ের অভাব ঘটলেই সমস্যা। ভয়ের অহেতুক অনুভূতি মনের মধ্যে চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে ফেললেই গণ্ডগোল। এই প্রসঙ্গে ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে যে সূ ফারাক আছে, সেটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। পরিচিত বা চেনা কোনও জিনিসের প্রতি সাবধান হওয়ার অনুভূতি হল ভয়। যেমন ধরা যাক, মেঘ জমলে বাজ পড়ার ভয়। আর উদ্বেগ হল অনাগত কোনও জিনিসের কথা ভেবে মানসিকভাবে আশঙ্কিত হওয়ার অনুভূতি। যেমন বন্ধের দিনে রাস্তায় বেরোলে গণ্ডগোলের আশঙ্কায় উদ্বেগ। অল্পবিস্তর উদ্বেগ সকলের মনেই থাকে এবং সেটি খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অহেতুক ভীতি সবসময়েই অস্বাভাবিক এবং চিকিৎসাযোগ্য।

শিশুমনের অস্বাভাবিক ভয়ের উপকেন্দ্রে পৌঁছানোর সঠিক কারণ জানা না থাকলেও সম্ভাব্য কিছু কারণ চিহ্নিত করা যায়। (১) জিনগত কারণ, এখানে সমস্যাটি বংশগত। (২) স্বভাবজাত প্রবণতা। (৩) ভীতিপ্রদ বা ভয়ানক অভিজ্ঞতাপ্রসূত (যেমন কুকুরে কামড়ানো)। (৪) অন্যদের আশঙ্কাজনক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত সংকেত। (৫) ইন্দ্রিয়লব্ধ নেতিবাচক অভিজ্ঞতা (যেমন পড়া বা শোনা বা সামাজিক মাধ্যমে দেখা)। **মানুষের মনে ভয়ের ডালপালা বিস্তারের পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে বিভিন্ন স্তরে।**

১) মানসিক বিকাশের স্তর — সদ্যোজাত শিশুর মূলত দুটি সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখে অনুমান করা হয় যে এই সহজাত ভয় পাওয়ার প্রবণতা আদি মানবের থেকে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুটি Moro's reflex এবং Startle response. প্রথমটি পড়ে যাওয়ার এবং পরেরটি উচ্চগ্রামের আওয়াজের ভয় থেকে নবজাতকের একটি নির্দিষ্ট শারীরিক বিভঙ্গ। এই নির্দিষ্ট দেহভঙ্গী বা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে বিদায় নেয়।

পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে শিশুর ক্রমবর্ধমান সচেতনতা, কল্পনার বিকাশ এবং সবশেষে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা থেকে অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনাকে আলাদা করার ক্ষমতা, শিশুটিকে ভয় বা ভীতি সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করে। ফলে রাক্ষস-খোক্কস-দত্যি-দানোর ভয় আস্তে আস্তে কেটে যায়। বহিরঙ্গের ভীতি, যেমন চোট লাগা, দুর্ঘটনা এসবের সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা তৈরি হয়।

২) পারিবারিক প্রবণতা — ডায়াথেসিস-স্ট্রেস অনুযায়ী, প্রবণতা এবং বহিরঙ্গের মানসিক চাপের যোগফল যখন সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তখনই সেটা ব্যারামরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আবার এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের ঠিকুজি কুলুজি লেখা আছে জিনে। জিন মানেই তাতে রয়েছে পারিবারিক কুলুজি। আর বহিরঙ্গের চাপ মানে আমাদের পরিবেশ। ২০১৩ সালে প্রকাশিত একটি মেটা অ্যানলিসিস এই ব্যাখ্যানকে মান্যতা দিয়েছে। এই মেটা অ্যানালিসিসে দেখা যাচ্ছে যে বেশি সংখ্যক মানুষের ভয় হল জীবজন্তুর থেকে। যেটা সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়। আর ভীতি বললে, রক্ত, শারীরিক চোট বা ইঞ্জেকশনই প্রাধান্য পাবে। ভীতির শিকড় মনের গভীরে ঢুকে গেলে কিন্তু মুস্কিল।

৩) আজকের অস্থির যুদ্ধবাজ দুনিয়ায় পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD) ভয় বা ভীতির বীজ রোপণ করে দিয়ে যাচ্ছে শিশুমনে। শারীরিক চোট, সকলের নজর এড়িয়ে মনের মধ্যে স্থায়ী আতঙ্কের সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে। সুতরাং সামাজিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-দাঙ্গা মানুষের মনের নিস্তরঙ্গ আবহে অস্থিরতার বাহক।

উপসর্গ — শৈশবকালীন ভয় এবং ভীতির অনুভূতি বিভিন্নরকম শারীরিক উপসর্গের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। যার মধ্যে বর্ধিত হৃদস্পন্দন, ভয়জনিত কাঁপুনি, শ্বাস নিতে অসুবিধা, মাথা ঘোরা বা হাল্কা মাথাব্যথা উল্লেখযোগ্য। অল্পবয়সি শিশুরা হঠাৎ বেশি কান্নাকাটি করে, অস্থিরতা প্রকাশ করে, পাগলের মতো বেসামাল আচরণ করতে পারে—যার মধ্যে কাছের মানুষকে বা পরিচিতজনকে হঠাৎ জাপটে ধরা উল্লেখযোগ্য।

কৈশোর বয়সে শিশুরা হয়ত তাদের গুরুজনদের কাছে, ভয় বা ভীতির অনুভূতি প্রকাশ না করে, আত্মস্থ করার চেষ্টা করে। ফলত অন্যতর কিছু শারীরিক উপসর্গ আরও প্রকট হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক শিশু টয়লেটে যেতে ভয় পায়। কারণ সেখানে সে একদিন একটি আরশোলা দেখতে পেয়েছিল। ক্রমাগত টয়লেট যাওয়া এড়ানোর ফলে শিশুটির কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা শুরু হয়ে যায়। নির্দিষ্ট ভয় বা ভীতিতে আক্রান্ত কোনও শিশুরা তাদের উদ্বেগ, কোনও আচরণের পৌনঃপুনিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করে। খুব সহজ উদাহরণ হল, পরীক্ষার খাতা পেয়ে বা প্রশ্নপত্র পেয়ে তাকে গুন গুনে পাঁচবার প্রণাম করা।

শিশুমনে এই ব্যারামের স্বাভাবিক গতিপথ— সব শিশুরই জীবনের কোনো কোনো না কোনো সময় ভয়ের একটা অনুভূতি থাকেই। দুই থেকে ছয় বছরের শিশুদের মোটামুটিভাবে চার রকম ভয়ের অনুভূতির হদিস পাওয়া যায়, যেখানে ৬-১২ বছরের শিশুদের মধ্যে সাতরকম ভয়ের অনুভূতি। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ভয়ের অনুভূতি সর্বাধিক হয় ১১ বছর বয়সে। তারপরে বয়সের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে ভয়ের অনুভূতি হ্রাস পেতে শুরু করে। বেশিরভাগ ভয়ের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী এবং শরীর এবং মনের সাধারণ বিকাশের অংশ হিসাবে সময়ের সাথে সাথে সেগুলি দূরীভূত হয়।

কী করণীয়?— ভয় বা ভীতির অনুভূতি কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্য হল শিশুকে ভয়ের সাথে মোকাবিলা করার এবং সেই অনুভূতিকে অতিক্রম করার ইতিবাচক উপায় শিখতে সাহায্য করা। ভয় বা ভীতিজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে তাকে বুঝতে শেখাটা শৈসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে খেলাধুলার মাধ্যমেই তথাকথিত ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা, যেমন ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর মুখোমুখি হয়ে তাকে অনুধাবন করার ক্ষমতা বাড়ানো। এই শিক্ষাপর্ব প্রাথমিক স্তরে বা একদম প্রথমদিকেই সেরে ফেলা উচিত। এই শিক্ষার প্রথম শিক্ষক নিঃসন্দেহে বাবা মা। একদম শৈশবে, যখন শিশুটির মনন একেবারেই অপূর্ণ, তখন শুধুমাত্র আদর আর ভালবাসাই শিশুমনের ভীতিপ্রদ অনুভূতির বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে উঠতে পারে। পরে বয়স বাড়লে, যখন শিশুমন শুভাশুভ বিচারের বিশ্লেষণে দড় হয়ে ওঠে, তখন প্রয়োজন হয় বিস্তারিত ব্যাখ্যান।

কিছু ভয়ের অনুভূতি, যেমন অন্ধকারের ভয় স্ব-সীমিত। রাতে ঘরে মৃদু আলোর উপস্থিতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল শেখানোর মতো সহজ কিছু পদ্ধতিই অন্ধকারের ভয় দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। অন্ধকারের শিকড় গাড়া অনুভূতি উপড়ে ফেলার আরেকটি পদ্ধতি হল 'বিবলিওথেরাপি' বা উচ্চস্বরে পড়ার অভ্যাস। আমাদের ছোটবেলায় গুরুজনেরা জোরে

জোরে পড়তে বলতেন, তার পেছনে যদি ফাঁকি আটকানো একটা কারণ হয়, আরেকটি উহ্য কারণ হয়ত এই ভয় বিতাড়ন। নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানে পৌঁছে মনে গভীরে প্রবেশ করে, তাকে আশ্বস্ত করে।

পিতামাতার প্রশিক্ষণ — শিশুদের ভয়-ভীতির চিকিৎসা করতে গেলে, তাদের অভিভাবকদেরও সম্যক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাঁদের জানা দরকার যে ভয় বা ভীতির অনুভূতি একটা বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক। বহির্জগতের জটিলতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পথে, এটি একটি স্বাভাবিক অনুভূতি, যেটা কিনা শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে অনুধাবন করতে শিখে যায়। অভিভাবকদের উচিত শিশুদের ভয়ের অনুভূতিকে স্বাবাবিক মনোবিকাশের একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা। তাকে অতিরঞ্জিত বা হেয় করা মোটেই উচিত নয়। ভয় বা ভীতির উৎসস্থল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। শিশুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিভাবকদের এই ধরনের মানসিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে মান্যতা দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁরা এমন কিছু করবেন না, যাতে উদ্বেগ মনের মাঝে আরও শিকড় গজিয়ে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে — • কার্যসিদ্ধির জন্য ভয় দেখানো। যেমন দুষ্টুমি করলে শিশুদের প্রায়শই বলা হয়, ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়ার কথা। এতে যুগপৎ ডাক্তারবাবু এবং ইঞ্জেকশন সম্বন্ধে শিশুটির মনে ভীতি দানা বাঁধে। • শিশুটিকে তার আচরণের জন্য হেয় করা। ধরা যাক একটি কিশোর আরশোলা দেখে ভয় পাচ্ছে। তাকে বলা হল সে একেবারে শিশুদের মতো আচরণ করছে বা মেয়েদের মতো আচরণ করছে। এই সমালোচনা মোটেই গঠনমূলক নয়। এতে কিশোরটি আরও অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। • শিশুর ভীতি বোধকে মান্যতা না দিয়ে অভিভাবকরা যদি চরম নিস্পৃহ থাকেন, সেটিও শিশুর কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেয় না। শিশুটি বড্ড অসহায় বোধ করতে থাকে। • অন্যদিকে অভিভাবকরা যদি আবার শিশুদের অতিমাত্রায় আড়াল করেন বা পরিমিত মাত্রায় ভীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হতে দেল, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বিস্তর গণ্ডগোল। যেমন ধরুন যখন একটি শিশুকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, দেখতে পাই যে বাবা-মা প্রায়শই শিশুটির মুখটি জোর করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখেন। এক্ষেত্রে শিশুটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে যদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, তাহলে তার অজানা ভয় বা উদ্বেগের পরিমাণটি কমে।

সহায়তা — ভয়কে জয় করার প্রারম্ভিক পদক্ষেপে শিশুর সার্বিক সহায়তার প্রয়োজন। একদম প্রাথমিক পর্যায়ে ভীতিপ্রদ বস্তু বা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে শিশুটিকে দূরে রাখতে হতে পারে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিশুটির মনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা খুব জরুরি। ধীরে ধীরে শিশুটির নিজের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে শিশুটিকে ভীতিপ্রদ বস্তু বা ভয়ের জিনিসের মুখোমুখি হতে দিতে হয়। অবশ্যই পারিবারিক এবং অভিভাবকদের সুরক্ষা বলয়ে। এইভাবেই শিশুটি ভয়কে জয় করতে শিখে যায়। উদাহরণস্বরূপ আবার সেই ডাক্তারবাবু আর ইঞ্জেকশনের কথাই ধরা যাক। শিশুমনে যদি এই বিশ্বাস জন্মে দেওয়া যায়, যে ডাক্তারবাবু ভালোর জন্যই ইঞ্জেকশন দেন, এই ইঞ্জেকশনের অল্প ব্যথা ভবিষ্যতের বড় রোগযন্ত্রণার ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারবাবু ব্যথা দেওয়ার জন্য ইঞ্জেকশন দেন না। এই জাতীয় সদর্থক আলোচনা না করলে, শিশুটি সারাজীবনের জন্য Trypanophobic বা সূঁচ-ভীতির শিকার হয়ে যায়। আর ডাক্তারবাবুদের সংস্পর্শে এলে শুরু হয় ডাক্তারি পোশাকে আতঙ্ক (white coat syndrome)।

মানসিক চিকিৎসার দরকার কোন শিশুদের? •যখন উপসর্গ মনে মধ্যে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, তার শারীরিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। • সামাজিকভাবে যখন সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। • প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের পরেও যখন শিশুটির বিশেষ উন্নতি হয় না।

শেষ করব vertigo ছবির শেষ দৃশ্য দিয়েই। এই দৃশ্যে যখন জুডি চার্চের ওপর থেকে পড়ে গেলেন, সেই মুহূর্ত থেকে ফার্গুসনের উচ্চতা ভীতি এক্কেবারে যেন গায়েব হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতা ফার্গুসনকে পূর্বাবস্থায় ফিরত নিয়ে গেল। এর জন্য খুব জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন হল না। ফার্গুসন নিজেই নিজেকে সামলালেন।

উ মা

‘স্বাস্থ্যের সাতকাহন’ বইটি এতদিন অখণ্ড ছিল। পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

বিকল্প চিকিৎসার পুনরুত্থান ও হোমিওপ্যাথি গবেষণার নতুন অভিমুখ

সুব্রত রায়

শেষ পর্ব

বোম্বে আইআইটি-র গবেষণা— সত্যি কথা বলতে গেলে, ২০১০ সালে আমাদের দেশে বোম্বে আইআইটি-র কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষকরা অতি-পাতলা হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে গবেষণাটি করেছেন, তা পদ্ধতিগত দিক থেকে বিচার করলে আদৌ মূল্যবান ছিল না। কিন্তু সময়কালটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাটি প্রকাশের কিছুকাল আগে হোমিওপ্যাথি নিয়ে ব্রিটেনে সরকার নিয়োজিত কমিটি হোমিওপ্যাথিকে অকেজো বলে সাব্যস্ত করেছিল। ভারতীয় মিডিয়া ওই ব্রিটিশ রিপোর্টের উপযুক্ত জবাব হিসাবে গবেষণাটিকে গণ্য করে এবং আমাদের দেশে তা নিয়ে কিঞ্চিৎ উন্মাদনাও তৈরি হয়।

গবেষণাপত্রটি পড়ে ওঠার আগেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, গবেষকরা যখন প্রত্যেকেই আইআইটি বোম্বের মতো দেশের প্রথম সারির বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের হয়ে গবেষণা করেছেন, এবং গবেষণার বিষয়বস্তুটিও অতি লঘু দ্রবণে ন্যানোপার্টিকেলের অস্তিত্বের রসায়ন সংক্রান্তই, তা হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিষয়ক কোনও জার্নালে প্রকাশিত না হয়ে কেন এটি ছাপা হল হোমিওপ্যাথির জার্নালে? গবেষণাপত্রটি খুঁটিয়ে পড়ার পর অবশ্য এই ধন্দ কেটে যায়। কারণ — ১) গবেষকরা বিভিন্ন ধাতু থেকে প্রস্তুত মাত্রার কতকগুলি বিশেষ ব্র্যান্ডের হোমিওপ্যাথি ওষুধ বাজার 6c, 30c ও 200c থেকে ক্রয় করেন। তারপর দ্রবণগুলি ফুটিয়ে দ্রাবকের পরিমাণ কমিয়ে আনলে স্বল্পমাত্রায় ধাতুকে সনাক্তকরণ ও তার পরিমাণ নির্ণয় করার উপযোগী আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে তাতে বিভিন্ন ধাতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গবেষণায় ব্যবহৃত মূল দ্রবণগুলি গবেষকরা নিজের হাতে বানান নি, গবেষণার গুণমানের দিক থেকে তথ্যটি আদৌ সম্মানজনক নয়। ২) গবেষকরা নিজেরাই এ রহস্যের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, লঘুকরণের সময়ে ধাতব ন্যানোপার্টিকেল-ন্যানোবাব্‌ল দ্রবণের উপরিতলে উঠে আসতে পারে। যেহেতু প্রত্যেকবার লঘুকরণের সময়ে এই উপরিতল থেকে দ্রবণ তুলে নিয়ে পুনরায় দ্রাবক মেশানো হয়, তাই দ্রবণের ঘনত্ব খাতাকলমে অ্যাভোগ্যাড্রো সীমার নীচে নেমে গেলেও দ্রবণে স্বল্প পরিমাণে ধাতুর উপস্থিতি বজায় থাকে। তাহলে, কী কারণে একে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা বলা হবে? বড়জোর এটি বলা যেতে পারে যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতকারীরা লঘুকরণের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ও দায়িত্ববান নয়। হোমিওপ্যাথিক উচ্চমাত্রার প্রভাব বিবেচনা করার জন্য গবেষণাটির জন্য নমুনা জোগাড়ের পদ্ধতি বাস্তবিকই হাস্যকর।

উপরের আলোচনা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, অতি-পাতলা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সংক্রান্ত গবেষণায় মৌলিক যুক্তির অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, জলের মধ্যে মূল ভেষজের 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' থেকে যায়, তারপরেও কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে 'বিজ্ঞান' হয়ে ওঠবার জন্য আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

১) এভাবে যদি হোমিওপ্যাথিক দ্রবণ ভেষজের 'স্মৃতিশক্তি' ধরে রাখতে পারে, তাহলে যে কোনও জলই ফার্মাসিউটিক্যালি সক্রিয় নয় কেন? জলমাত্রেরই কিছু না কিছু ইতিহাস তো থাকবেই। ২) বাষ্পায়নের সময়ে উবে যাওয়া জল বা হোমিওপ্যাথিক দ্রবণ থেকে 'স্মৃতি'ও উবে যায় না কেন? ৩) জল শুধু বেছে বেছে ভেষজের স্মৃতিই কেন ধরে রাখবে, কেন তাতে শিশির কাচের সিলিকেটের বা কর্কের রাবরের কিংবা বাতসের উপাদান বা তাতে ভেসে থাকা ধুলোকণার স্মৃতি থাকবে না? ৪) সুগার বটিকার ক্ষেত্রে ভেষজের স্মৃতি কীভাবে সংরক্ষিত হবে? ৫) ওষুধের শিশিতে বস্তুকণা খুঁজে পাওয়া কখনই কোনও চিকিৎসার ক্রিয়াবিধির রূপরেখা হতে পারে না। এই 'স্মৃতি'র সঙ্গে রোগ সারানোর ক্ষমতার সম্পর্ক কী? মূল ভেষজটির মধ্যে রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে, এবং জলের মধ্যে তার ধরে রাখা স্মৃতিও আছে, এইসব আশ্চর্য সিদ্ধান্ত যদি তর্কের খাতিরে আদৌ ধরে নেওয়াই হয়, তাহলেও তো প্রশ্ন থেকে া/যয়, ভেষজে রোগ সারলেই যে তার 'স্মৃতি'তেও রোগ সারবে, সে গ্যারান্টি কোথায়? সে তো আবার আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখাতে হবে!

হোমিওপ্যাথির গবেষণা : পথের শেষ কোথায়?

হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও একজন সৎ ও তথ্যাভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ অবশ্যই একথা মেনে নেবেন যে, 'হেমিওপ্যাথির ক্রিয়াবিধির জুতসই একটা হাইপোথিসিস দরকার' অথবা 'আমরা জানি না কীভাবে ও কেন হোমিওপ্যাথি কাজ করে' কিংবা কিঞ্চিৎ আক্ষেপের সুরে 'হ্যানিম্যানের পর ২০০ বছর কেটে গেলেও হোমিওপ্যাথির ক্রিয়াবিধি শুরুর দিনগুলির মতোই অজ্ঞাত'। কিন্তু কার্যকারিতার প্রশ্নে তাঁদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সর্বাধক গুরুত্ব দেন, এ ব্যাপারে আধুনিক ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার ফলাফলগুলি খোলা মনে মেনে নেওয়ার উদারতা সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। এঁদের কেউ কেউ এমন যুক্তির অবতারণাও করেন যে, 'হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় নি ঠিকই, কিন্তু একে নিশ্চিতভাবে অপ্রমাণও করা যায় নি' অথবা 'এটি বলা অসম্ভব যে, কোনও হোমিওপ্যাথি ওষুধই কোনও রোগ সারায় না'। মুশকিল হচ্ছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে কোনও কিছুকে প্রমাণ করা যত সহজ, অপ্রমাণ করা ততই কঠিন। প্রতিটি রোগাবস্থার জন্য প্রতিটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কার্যকারিতা যদি বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণিত না-ও হয়, নতুন নতুন মেটিরিয়া মেডিকা প্রস্তুত করে নতুন নতুন ভেষজ দিয়ে নতুন নতুন রোগের জন্য পরীক্ষানিরীক্ষার আবদার চালিয়ে যেতে তো কোনও বাধা নেই!

ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি হয়তো আরেকটু জটিল রূপ নেবে যে, সমাজে কোনও চিকিৎসার টিকে থাকার বিষয়টি কি কেবলই একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে আলোচিত হবে? মহামারী পরিস্থিতিতে বিপজ্জনক হতে পারে জেনেও আমজনতার ইমিউনিটি বাড়ানোর ভুয়ো আশ্বাসের সঙ্গে অকেজো আর্সেনিকাম অ্যালবাম 30c দেদার বিলি বাটোয়ারা চলতে থাকবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে? ব্রিটেন বা অস্ট্রেলিয়ায় যেভাবে হোমিওপ্যাথির মূল্যায়নে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছিল বৈজ্ঞানিক বিচারকেই, তা কি আমাদের দেশে বা বিশ্বের অন্যত্রও প্রযোজ্য হতে পারে না? রাষ্ট্রনেতারা স্বীকার করুন বা না করুন, স্বাস্থ্যের বিষয়টি জনগণের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার অর্জন ও রক্ষায় জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার হওয়া নিয়ে কারুর কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

প্রান্তটীকা ১. সমকালীন প্রচলিত চিকিৎসাকে বোঝানোর জন্য হ্যানিম্যান 'অ্যালোপ্যাথি' শব্দটি সৃষ্টি করেন। শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় ১৮৩৩ সালে, *অর্গ্যানন*-এর পঞ্চম সংস্করণে। সুস্থ শরীরে দৃষ্ট ভেষজ-উপসর্গের সঙ্গে রোগলক্ষণের সাদৃশ্যের অনুকৃতিমূলক জাদুতে বিশ্বাসী হ্যানিম্যান যেমন নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে 'হোমিওপ্যাথি' নাম দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চিকিৎসার অন্যান্য পদ্ধতিগুলিও এই জাদু-নিয়মের ভিত্তিতেই নামকরণ করেছিলেন। এভাবেই 'অ্যান্টিপ্যাথি', 'আইসোপ্যাথি' ইত্যাদি শব্দ জন্ম নেয়। তবে কখনও চিকিৎসার ইতিহাসে 'অ্যালোপ্যাথি' শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের চিকিৎসাকে এবং বিশেষ করে এই ধারণাকে বোঝানো হয়ে থাকে যে, ওষুধ যত বেশি সংখ্যক উপাদান মিশে থাকবে তা তত বেশি কার্যকর হবে। **২.** হোমিওপ্যাথির লেখাপত্রে জীবাণুকে রোগের কারণ হিসেবে অস্বীকার করার প্রচুর দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। **৩.** হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ নির্বাচনের জন্য 'রেপার্টরি' নাম পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়। এতে নির্দিষ্ট রোগলক্ষণের সাথে যুক্ত প্রতিটি ওষুধকে অনুভূতির তীব্রতাসহ সাজানো থাকে। হোমিওপ্যাথ রোগীর প্রতিটি লক্ষণের সাথে যুক্ত ওষুধগুলির নাম তালিকাবদ্ধ করেন। **৪.** ওষুধ নির্বাচনের জটিলতা এড়াতে কখনও কখনও ওষুধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা হয় অথবা নির্দিষ্ট ওষুধের সাথে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সংযুক্ত করে রোগ নির্বিশেষে ওষুধটির নিদান দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলে স্বভাবগত শ্রেণিবিন্যাস। 'স্বভাবগত' বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন শ্রেণি গঠিত হয়; যেমন — বেলেডোনা টাইপ, চায়না টাইপ, ল্যাকেসিস টাইপ ইত্যাদি। **৫.** হোলিজম মনে করে, সামগ্রিকতা তার অংশগুলির যোগফলের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু। বিংশ শতকে উদ্ভূত এই ধারণাটির প্রথম প্রয়োগ করেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিবিদ জান স্মাট্স (১৮৭০-১৯৫০)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *Holism and evolution* নামক রচনায় এই শব্দটিকে প্রথমবার ব্যবহার করা হয়। **৬.** জীবনীশক্তিবাদ (vitalism) মনে করে যে ভৌত-রাসায়নিক নিয়মকানুন দিয়ে জীবনের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ জীবন আসলে এক অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 'জীবনীশক্তি' নামে চিহ্নিত এই শক্তি কোনও ভৌত-রাসায়নিক নিয়মের অধীন নয়, তা পুরোপুরি স্বনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং জীবনের প্রকৃত স্বরূপ চিরকালই মানুষের অজানা রয়ে যাবে। ঊনবিংশ শতকের জার্মান রসায়নবিদদের মধ্যে জীবনাশক্তিবাদের প্রভাব ছিল। এই মতবাদে বিশ্বাসী সুইডিশ রসায়নবিদ জেকব বার্জেলিয়াস (১৭৭৯-১৮৪৮) মনে করতেন যে, অজৈব বস্তুর নিয়মকানুন

দিয়ে কখনও জৈব বস্তুর নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বিশ্বাসে আঘাত হানেন বার্জেলিয়াসেরই জার্মান ছাত্র ফ্রেডরিখ ১৮২৮ সালে অজৈব যৌগ থেকে ইউরিয়া নামক জৈব যৌগ সংশ্লেষ করতে সক্ষম হন। ৭. আধুনিক চিকিৎসাকে দার্শনিকভাবে 'বায়োমেডিসিন' হিসেবে গণ্য করা হয়। ক) এতে রোগ ও রোগের কারণ ভৌত রাসায়নিক ও জীববিদ্যাগত জ্ঞানের ওপরে নির্ভরশীল ও তা দ্বারা সীমায়িত, খ) প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করে ভেঙেই সমগ্রতার অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। গ) তা এমন কোনও গবেষণা প্রশ্নকে বরদাস্ত করে না, যা ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার আধুনিক মানদণ্ডে পরীক্ষাযোগ্য নয়। ৮. উত্তর-আধুনিকতা অনুসারে, প্রাকৃতিক সত্য অন্বেষণের বৈজ্ঞানিক তাগিদের পেছনে আসলে লুকিয়ে আছে এক 'ক্ষমতার দ্বন্দ্ব'। চিকিৎসা ক্ষেত্র নিয়ে এর প্রধান অভিযোগ হল, অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিকল্প চিকিৎসাকে এখানে যে বারবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, 'বায়োমেডিসিন'-এর উৎকর্ষই তার একমাত্র কারণ নয়; এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে 'বায়োমেডিসিন'-এর উচ্চতর অবস্থান ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বই নাকি মূল ভূমিকা পালন করছে। পাশ্চাত্যে দীর্ঘমেয়াদী কর্তৃত্ব বজায় রাখার সুবাদে তা নাকি অন্যায্যভাবে বিকল্প চিকিৎসাকে দমিয়ে রেখেছে, বিকল্প চিকিৎসার যৌক্তিক দাবিগুলিকেও তা বিবেচনা করতে চায় না। ৯. মানুষের ভাবজগতের যে সূত্রগুলির ভিত্তিতে জাদুবিশ্বাস পরিচালিত হয়, দুটি বস্তু বা বিষয়ের আপাতসাদৃশ্য তার অন্যতম। দুটি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে গঠনগত, উপাদানগত ও প্রকাশগত মিল থাকলে মনে করা হয় যে, এদের মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে—একটি অন্যটিকে প্রভাবিত বা প্রতিস্থাপিত করতে পারে। বিশ্ববন্দিত নৃতত্ত্ববিদ জেমস্ প্রেজার জাদুর এই নিয়মটিকে অনুকৃতিমূলক জাদু বলে অভিহিত করেছেন। চিকিৎসার ইতিহাসে এই ধরনের জাদুর সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। রেনেসাঁ যুগের বিশিষ্ট রসায়নবিদ প্যারাসেলসাস (১৪৯৩-১৫৪১) এতে বিশ্বাস করতেন এবং যতদূর জানা যায়, তিনিই এর নাম দিয়েছিলেন সাদৃশ্য-লক্ষণ বিধি। এর ভিত্তিতে প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া মানব অঙ্গের সদৃশ বস্তু দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের চিকিৎসা করা হত। হ্যানিম্যানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি প্যারাসেলসাসের জাদুবিশ্বাসকেই নতুন করে রূপ দিয়েছিলেন। ১০. বিজ্ঞানে নতুন কোনও আবিষ্কারের দাবির সাথে সাথেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের অংশ হয়ে ওঠে না। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নিরপেক্ষভাবে দাবিটিকে খতিয়ে দেখেন, পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে মূল গবেষণাটিকে পুনঃসম্পাদন করে ও অন্যান্যভাবে দাবিটি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। সত্যিকারের বিজ্ঞান থেকে অবিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের এই স্বভাবগত ছাঁকনিটিকেই বলা হয় সুসংগঠিত সংশয়বাদ। ১৯৬০-এর দশকে কয়েকজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী দাবি করেন যে, তাঁরা নতুন এক ধরনের জল আবিষ্কার করেছেন, যার ভৌত ধর্ম (ঘনত্ব, সান্দ্রতা, হিমাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক) সাধারণের চেয়ে আলাদা। ১১. অসম্ভব, অভাবনীয় ও মজাদার গবেষণা বা উদ্ভাবনের জন্য ১৯৯১ সাল থেকে খানিকটা নোবেল পুরস্কারের প্যারডির ঢঙে ইগ্-নোবেল পুরস্কার চালু হয়েছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পুরস্কারটি নিখাদ মজার পাশাপাশি কখনও কখনও বিবেকের দরজাতেও কড়া নাড়ে। 'অ্যানালস্ অব ইমপ্রোব্যাবল রিসার্চ' নামক বিজ্ঞান বিষয়ক স্যাটায়ারধর্মী পত্রিকা এর উদ্যোক্তা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রেক্ষাগৃহে প্রত্যেক বছর ইগ্-নোবেল পুরস্কার প্রদান ও সংশ্লিষ্ট বক্তৃতার আসর বসে। 'শান্তিপূর্ণ' পরমাণু বোমা পরীক্ষাকরণের জন্যে ভারত-পাকিস্তান-ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধানদের 'শান্তি' বিভাগে ইগ্-নোবেলের জন্যে মনোনীত করার মাধ্যমে বিদ্রুপের তীব্র কশাঘাতও আছড়ে পড়ে। হোমিওপ্যাথি গবেষক বঁভনিস্ত দু-দুবার ইগ্-নোবেল জয়ের বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন—জলের 'স্মৃতিশক্তি' প্রমাণের চেষ্টার জন্য ১৯৯১ সালে এবং ১৯৯৮ সালে টেলিফোন লাইন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জলকে 'তেজীকৃত' করার দাবি জানানোর জন্য।

তথ্যপঞ্জী

উৎস মানুষ (১৯৯৬) : হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান, কলকাতা উৎস মানুষ

বসু, পরমেশ (১৯৯৪): হোমিওপ্যাথি ও আধুনিক বিজ্ঞান, কলকাতা বিশ্বকোষ পরিষদ

রায়, সুব্রত (২০২০) : 'নাৎসি দুঃস্বপ্ন : হোমিওপ্যাথি ও জার্মান জাতীয়তাবাদ', একুশ শতকের যুক্তিবাদী, ২৩ (বি.), ফেব্রুয়ারি ২০২০: ৪-৩৪।

উ মা

বেটি বাঁচাও

পূরবী ঘোষ

চন্দ্রযান বিক্রমের চাঁদের মাটি ছোঁয়ার আনন্দে মোটামুটিভাবে দেশের শিক্ষিত মানুষজন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীমহল, মন্ত্রী-সান্ত্রী ও নামিদামী স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা যখন উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভাসছে, সেই সময়ে আমি এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হলাম, যে ঘটনা আমাদের বাংলার গ্রামে গঞ্জে প্রায়শই ঘটে চলেছে। আমার দেখা ও শোনা ঘটনাটি যা আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, যেগুলো বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে ইচ্ছে করল।

গত ৩ আগস্ট দুপুর ১২টা নাগাদ একটি ছেলে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পাপোষ ফেরি করছিল। হঠাৎ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে এসে পাপোষ নেওয়ার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগল, প্রথমটা না-না করেও শেষে দুটো পাপোষ পছন্দ করে আমি দাম জানতে চাইলাম। সে বলল ১৮০ টাকা, আমি নেব না বলে চলে আসতে যাচ্ছি সে আমার পা-দুটো জড়িয়ে কেঁদে ফেলল। প্রথমটা আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বসিয়ে কোথা থেকে আসছে জানতে চাইলাম। সে জানাল, রানাঘাটের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসেছে। কান্না-ভেজা গলায় সে বলল বাড়িতে তার একার রোজগারে আটটি লোকের পেট চলে। তাই সুদূর গ্রাম থেকে বেরিয়ে এক একদিন বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর এই সব অঞ্চলের ভেতরের গ্রামগুলোয় ফেরি করে মাল বেচি। আজ সকাল থেকে মাত্র ২৪০ টাকার বিক্রি হয়েছে। মা-গো দয়া কর, পাপোষ দুটো তুমি নাও। ঘরে আমার ১১ বছরের একটা বেটি আছে, কিন্তু আমার বেটা চাই তাই নিয়ে রোজ ঝগড়াঝাঁটি ও বউটাকেও গালিগালাজ লেগেই রয়েছে। তাই অতিষ্ঠ হয়ে বেটা নিতে গেলাম, কিন্তু পোড়া কপালে এল একটা নয়, দুটো বেটি। বলুন তো এই দায় কি বৌয়ের? এটা কি দোকানে কিনতে পাওয়া যায় যে পছন্দ করে নিয়ে আসব? বাবা-মা এইসব বুঝতেই চাইছে না। তারা আমার বউ-এর ওপর সমানে চাপ দিয়েই যাচ্ছে, যে করেই হোক বেটা আনতেই হবে। বউ প্রতিবাদ করে দু-চার কথা বলার পরে প্রতিদিন চলছে গালিগালাজ, মারধোর। বউ এখন তার মেয়েদের নিয়ে আত্মঘাতী হতে চাইছে। আমি কি করব, বলেই কেঁদে ফেলল। তাঁর কথা শুনে আমি আমার শহুরে কেতাবি ভাষায় বললাম, মেয়ে তো কি হয়েছে, ভাল করে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করুন, ওরাই আপনার সংসার সামলে দেবে। আমার কেতাবি কথা শুনে ছেলেটি চোখের জল মুছে কঠিন স্বরে বলে উঠল—আর যদি মা ও মেয়েদের বাঁচাতেই না পারি? উত্তর আমার জানা নেই। তাই চুপ করে রইলাম। সে তাঁর মালপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, মা-গো ব্যাটা-বেটি তো আল্লার দান। মানুষের কিছু করার থাকে কি? এর উত্তরেও চুপ করে থাকলাম। সে চলে গেল। কিন্তু সারাদিন ধরে আমার মাথায় এই প্রশ্ন ঘুরতে থাকল যে আমরা দীর্ঘদিন জনমুখী বিজ্ঞান আন্দোলন করেছি, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকা পড়েছি, মিছিলে হাঁটছি, মিটিং করছি, কিন্তু তার ফল কি হচ্ছে? প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষগুলোর কাছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা কতটা পৌঁছে দিতে পারছি? ছেলেদের দিয়ে বংশ রক্ষা হবে, তাই ছেলে হতে গিয়ে মা মরে যায় যাক, তবুও বংশ তো রক্ষা পাবে! এই বিশ্বাস কতটা দূর করতে পেরেছি? এই প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছেই নেই। সত্যিই কি বিজ্ঞান তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে? চন্দ্রযান বিক্রম মানুষ না যন্ত্র, সেটা ভাঙল কি চাঁদে নামল, তা জেনে এইসব মানুষগুলোর রুজির লড়াই-এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হবে না। তাই তাদের এ নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই। আমারও জানা নেই যে সারাদিন মাথায় বোঝা নিয়ে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম হেঁটে ঘুরে ৫৮০ টাকা রোজগার করা যাবে কিনা?

প্রাবন্ধিক ও ছড়াকার ভবেশ দাশ ১৯৮৪-তে রাকেশ শর্মার মহাকাশ যাত্রার পর এই পত্রিকায় একটি পদ্য লিখেছিলেন। তা থেকে উদ্ধৃত দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। লেখকের করা সেই প্রশ্ন কখন যে আমার হয়ে গেল তা টের পেলাম না।

আচ্ছা রাকেশ আচ্ছা— বিজ্ঞানটাকে সেও জানবে, নর্দমা ঘাঁটা বাচ্চা।

উ মা

পুস্তক পর্যালোচনা

কমিউনিজম কী?

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রকাশক— ঠিকঠিকানা, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২

মূল্য - ১০০.০০। পৃষ্ঠা- ৬৪। প্রকাশনা বর্ষ - ২০২২

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৪৭-২০২২), *কমিউনিজম কী* (২০২২) শীর্ষক গ্রন্থটির ভূমিকাতে লিখছেন— সেই দেশ অবশ্যই কাল্পনিক, এখনও তার কোনো খোঁজ মিলবে না। কিন্তু সেই কল্পনার সমাজে কী কী থাকবে আর থাকবে না তা নিয়ে আমাদের অনেকেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। যদিও 'কমিউনিস্ট নামধারী অনেক কটি পার্টি ভারতে ও অন্যত্র আছে। সেইসব পার্টির নেতাদেরও জিজ্ঞাসা করলে দ্যাখা যাবে: রাষ্ট্র ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করার পরে, যে-সমাজ তৈরি হবে তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে তারা কিছু বলতে অপারগ'। লেখকের মতে, এটি এমন এক সময়ের কল্পনা যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই কমিউনিস্ট ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে অল্প কিছু পিছিয়ে পড়া দেশে পুরনো আদ্যিকালের প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র টিকে রয়েছে। এই অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বসবাসকারী দুই বন্ধুর একজন কমিউনিস্ট দেশে বেড়াতে গিয়ে তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুকে মোট ৯টি চিঠি মারফত কমিউনিস্ট সমাজের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্বকে তুলে ধরেছে। বইটির আংশিক পরিচিতি নীচে দুটি লাইনে ভারি সুন্দরভাবে লেখক বুঝিয়ে দিয়েছেন — 'সব পেয়েছির দেশে কারো নাইরে কোঠাবাড়ি/ দুয়ার খোলা পড়ে আছে কোথায় গেল দ্বারী।'

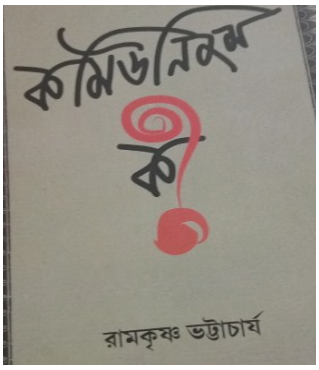

কমিউনিস্ট সমাজে গৃহস্থালীর খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় সামগ্রী, পোশাক-আশাকও নাগরিকরা যার যতটা প্রয়োজন সে অনুযায়ী ডিজিটাল কুপনের মাধ্যমে স্টোর থেকে সংগ্রহ করে। কমিউনিস্ট সমাজে ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি বলে কিছু হয় না। সরকারের আবাসন বিভাগ থেকে সকলের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ন্যায় কমিউনিস্ট সমাজে চিকিৎসার কোনো খরচও নেই। রোগীর পরিবারকে চিকিৎসা সম্বন্ধে ভাবতে হয় না। নাগরিকদের বেতন থেকে খুব সামান্য অংশ স্বাস্থ্যবীমার জন্য কেটে নেওয়া হয়। তা থেকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কমিউনিস্ট সমাজে অ-ধর্মীয়, অবৈতনিক এবং বৃত্তিমূলক ও হাতে-কলমে শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয় কমিউনিস্ট সমাজে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হল আদতে পলিটেকনিক। সকলের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি সকলের জন্য কাজের সুযোগ এই সমাজে নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে কমিউনিস্ট সমাজে বেকার বলে কিছু নেই। কমিউনিস্ট সমাজে ধর্মের প্রভাব না থাকায় অধিকাংশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাথে জনগণের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন বজায় থাকে। সে দেশে পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হল সব দেশের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এছাড়াও এই সমাজে সব ধরনের সংখ্যালঘুর (লিঙ্গ, এথনিক, ধর্ম, ভাষা) সমান অধিকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক দিকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই সমাজে নোট এবং কয়েনের চল নেই। বলতে গেলে এটা প্রায় বাতিলই হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে যাবতীয় ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ডিজিটাল কুপনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কে কতটা পাবে তা নির্ধারিত হয় মানুষের দরকার বা প্রয়োজন অনুযায়ী, কাজ অনুযায়ী নয়।

আলোচ্য বইটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল এর শেষ অধ্যায়টি। এই অংশে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে এমন ধরনের সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল: কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও অর্জনের প্রথার সম্পূর্ণভাবে বাতিলকরণ, রাষ্ট্রের বিলুপ্তিকরণ, শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির সমবায়ীকরণ, বস্তুগত উদ্দীপকের

পরিবর্তে নৈতিক উদ্দীপকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, ব্যক্তির ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টির স্বার্থের ওপর স্বীকৃতি প্রদান, (যদিও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানানো হয়) ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন যে কমিউনিস্ট সমাজে সাম্যের অর্থ হল সব সম্পদ দেশে সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া। লেখক সাম্যের অর্থ বলতে বুঝিয়েছেন কমিউনিস্ট সমাজে অধিকার ও সুযোগের নিরিখে অবশ্যই সাম্য আছে। কিন্তু সব মানুষই সমান অতএব তাদের চাহিদাও সমান সাম্য সংক্রান্ত এমন উদ্ভট ধারণা কমিউনিস্ট সমাজে চলে না। বরং সাম্য মানে দেশের সম্পদ সকলের মধ্যে সমানভাবে বেঁটে দেওয়া নয় বরং প্রত্যেকের দরকার অনুযায়ী কম বা বেশি পাওয়া। এই হল কমিউনিস্ট সমাজের মূলনীতি। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূলনীতি ছিল প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুযায়ী, প্রত্যেকে পাব তার কাজ অনুযায়ী। আর সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুযায়ী। প্রত্যেকে পাবে তার দরকার অনুযায়ী। এইভাবে কাজ থেকে এল দরকারে ধারণা। এই সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে কমিউনিস্ট সমাজের মূল প্রভেদ।

তবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার যোগান কোথা থেকে আসবে লেখক সে কথা বলেন নি। এই কাল্পনিক সমাজে বিরুদ্ধ মতামতকে খোলাখুলি প্রকাশ করা যাবে কিনা বা তা করতে গেলে দমন-পীড়ন করা হবে কিনা তার উল্লেখ নেই। এই বই পড়তে কোথাও হোঁচট খেতে হয় নি। মনে হয় পাশাপাশি বসে জমাটি আড্ডা চলছে।

— অভিজিৎ সাহা

উমা

ইচ্ছাপত্র

শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল হরিণঘাটা উৎস মানুষ পাঠচক্রের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও স্থানীয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংগঠক। উৎস মানুষ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সেই আশির দশক থেকে। সতীশবাবুর ইচ্ছাপত্রটি আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হল — সম্পাদকমণ্ডলী

‘আমার শেষ নিঃশ্বাসের পর,
প্রাণহীন দেহটা আগুনে না পোড়াবে,
না দিবে কবর, না ভাসাবে জলে।
অন্ধজনে দিতে আলোর সন্ধান
দুটি নয়ন করে দিবে দান
কোন বিশ্বস্ত চক্ষু হাসপাতালে
দুজন অন্ধের চোখে মোর কর্ণিয়া দুটি
হবে প্রতিস্থাপন।
তোমাদের কাছে যাহা ফেলে দেওয়া ধন
সেই নয়ন যুগল হবে অন্ধের অমূল্য রতন।’
অতঃপর ...

সরকারি কোনো মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল নিথর দেহটাকে পৌঁছে দেবে অ্যানাটমি বিভাগের কর্তৃপক্ষের হাতে। কর্তৃপক্ষ গ্রহণ প্রমাণ পত্র দিবে। সযত্নে ‘দেহদান প্রমাণ পত্রটি’ লবে। তাহে ভুলেও করিবে না ভুল। লাগিবে প্রমাণ পত্র সংসারের নানা প্রয়োজনে।

বলে রাখি — মরণের পরে না হয় যেন কোনো পারলৌকিক ক্রিয়া বা শাস্ত্রীয় আচার পালন। বিশ্বাস নাই আত্মায়, আত্মার যুক্তিতে। বিশ্বাস নাই কল্পিত স্বর্গে।

শ্রী সতীশচন্দ্র মণ্ডল

উমা

পাঠকের চিঠি

এক সন্ধ্যায় দুটি কিশোর উপস্থিত। আমার 'অবকাশ' নাম শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে একদা সদস্য ছিল এরা। ইতিমধ্যে লকডাউন নামক সর্বগ্রামী অপরিহার্য ব্যবস্থায় পাঠাভ্যাসে পূর্ণচ্ছেদ টেনে, আমার উপস্থিতি প্রত্যাশা করে একটি পত্র আমার হস্তে অর্পণ করে জানাল, তারা এই বছর থেকে এই পাড়ায় একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করতে চায়। সেই সম্পর্কিত সভায় আমি যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকি —এই বিনয়।

প্রায় পঞ্চাশ বছর চার্চের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে। স্ত্রী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বারংবার তাকে ধর্মান্তরিত করার এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে একমাত্র পুত্রকেও ধর্মান্তরিত করার প্রবল চাপ এসেছে। এমন কি আমার মৃত্যুর পর আমার শেষকৃত্যের পরিণতি নিয়েও সাবধান করা হয়েছে। আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির ঠিকাদারি নিয়ে আমাকে বহুবার সতর্ক করেছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। আমি বাইবেল পাঠ করেছি, এখনও করি যেমন মনে হলে রবীন্দ্র রচনাবলী পাঠ করে থাকি। কিন্তু চার্চে যাওয়ার আগ্রহ কোনদিনই বোধ করি নি। তাই এই সম্প্রদায়ের থেকে দূরে অখ্রিষ্টিয় পরিবেশে স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত নিই। সেটা '৮৫ সাল। ভেবেছিলাম বামপন্থার পৃষ্ঠপোষকতা পাব। দেখলাম পুজোর মরসুমে সন্ধ্যায় পরিচিত শব্দবন্ধ — দাদা আমরা এসেছিলাম।

এখানে কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরির উদ্যোগে ছোট করে একটি শীতলা পুজো হত। ক্রমশ তার আনুভূমিক বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেল। আমি শিশুদের নিয়ে একটি শিক্ষা সংস্কৃতি কেন্দ্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটুকরো জমির জন্য দরবার করেছিলাম বহুবার, মেলে নি। ইতিমধ্যে শীতলা থানে পাথর বসেছে, পাশে একটি শনি মন্দির ও একটি শিব মন্দিরও স্থাপিত হয়েছে। পথ চলতে মন্দিরের সামনে থমকে নমস্কার অথবা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাতে ভুল হয় না কোনো পথিকের। পুরোহিতের তরফ থেকে একদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল আমাকে—সকলে চরণামৃত গ্রহণ করে আপনি কেন করেন না। সবিনয়ে জানিয়েছি — মা শীতলা আমার হৃদয়ে বিরাজমান।

আমার বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে একটি দুর্গাপূজা হয়, এ বছর থেকে একই দূরত্বে বিপরীত দিকে আর একটি শুরুর বাদ্যি বেজে গেল। আমার অর্বাচীনের পদভার রাখার মাটির ঢেলাটা খুঁজছি।

শেষমেশ জনগণের প্রফুল্ল সমর্থনে দুর্গাপূজার প্রথম বৎসরের উদযাপন অনুমোদন পেয়ে গেল। ছোটরা চিৎকার করে উঠল—ডিজে বাজবে। পাড়ার কয়েকজন যাঁরা কোনো এক রাজনৈতিক দলের কট্টর সমর্থক বলে পরিচিত পুজো কমিটির কত্তা হলেন। একদিন বেশ রাতের দিকে এক কত্তা মহাশয় বাড়িতে এসে হাজির। 'আরে মশাই বলবেন না, ছেলেপুলেরা এমন করে ধরলে, না বলতে পারলুম না।' এই ছেলেপুলেরাও আমার পরিচিত। পুজোর মিটিংয়ে আমাকেও ডেকেছিল, যাই নি। সেই কত্তামশায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা মিটিংয়ে এলেন না কেন?' কৌতূহলী প্রশ্ন। বিগত ৩৫ বছর পাড়ার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সর্বদাই উপস্থিত থেকেছি। এমনকি কালীপুজোর অনুষ্ঠানেও। এছাড়া শিক্ষা বিস্তার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সময়ও। যখন 'অবকাশ' নামক শিক্ষাচর্চা কেন্দ্রে ছোটরা হৈ হৈ করে ছুটে চলেছে, একদিন কানে এল— সব নাচতে যাচ্ছে। মন্তব্যটি করেছিলেন এই কত্তামশাই। সবাই শুনেছেন।

ধর্মের প্রতি কোনো দলীয় বা সরকারি কোনো নজর বা পৃষ্ঠপোষকতাকে বর্জন করা কী একেবারেই অসম্ভব? রাজ্য জুড়ে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিযুক্ত মানসিকতা গড়ে তুলতে নিরন্তর প্রচার, আলোচনা, সভাসমিতি, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক সভার আয়োজন করে গ্রামগঞ্জের প্রতিটি প্রান্তে কি এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব যে ধর্ম নয়, মানুষে মানুষে ভালবাসাই শেষ কথা।

সুব্রত গোমেশ
পশ্চিম সালেপুল, ঘোষপাড়া, বারুইপুর

গ্রাহক চাঁদা

সাধারণ ডাকযোগে পত্রিকা পাচ্ছেন না বলে অনেক গ্রাহক স্পিড পোস্টে পত্রিকা নিচ্ছেন। তার জন্য বাৎসরিক চাঁদা ২২০.০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সাধারণ ডাকের ক্ষেত্রে গ্রাহক চাঁদা একই থাকছে। আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ই-মেইল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর/ইমেইল আই ডি জানাবেন।

— পরিচালকমণ্ডলী

উৎস মানুষ **WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 40.00**

৪৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ ৪০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — ৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক:	
রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) haritbooks@gmail.com

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/